বীক্ষণ

BIKSHAN

বীক্ষণ

সম্পাদক

ডঃ বিশ্বজিৎ কর্মকার

হুগলী উইমেন্স কলেজ

হুগলী

BIKSHAN
Collection of essay
Editor-in-Chief Dr. Biswajit Karmaka

Frist published : 01.02.2024

ISBN : 978-93-6128-474-8

Cover Design : Biswajit Karmakar & Anupam Sharma

Publishar
Principal
Hooghly Women's College
Hooghly, Pipulpati
West Bengal

Print
Lahor Publication House
B-5/44Kalyani, Nadia-741235
&
I.I.C.E, Kancharapara
(N) 24Pgs

Price 350

Advisory Board

* Dr. Sima Banerjee, Principal, Hooghly Women's College.
* Dr. Aparna Roy, Professor, Visva Bharati University.
* Dr. Mir Rejaul Karim, Professor, Aliah University.
* Dr. Srabani Paul, Professor, Rabindrabharati University.
* Dr. Arupkumar Das, Professor, Calcutta University.
* Mr. Santanu Basu, Professor, NSD, Delhi.
* Dr.. Santanu Das, Professor, Rabindra Bharati University.
* Dr. Tapas Kumar Mondal, Asso. Professor, Kalyani University.
* Dr. Somjyoti Mridha, Assistant Professor, North Eastern Hill University.

Editorial Board

* Dr. Jana Bandyopadhyay, Associate Professor, Department of Sanskrit, Hooghly Women's College.
* Dr. Samadyuti Haldar, Associate Professor, Depeartment of Matnmatics, Hooghly Women's College.* Dr. Biplab Mondal, Associate Professor, Department of Chemistry, Hooghly Women's College.
* Dr. Nirmalya Sensharma, Associate Professor, Department of Bengali, Hooghly Women's College.
* Dr. Lily Mondal, Assistant Professor, Department of English, Hooghly Women's College.
* Gurudas Biswas, Assistant Professor, Depeartment of Matnmatics, Hooghly Women's College.

Co-Editor-in-Chief

*Dr.Punarbasu Bose, Associate Professor, Depeart of Physic, Hooghly Women's College.

Editor-in-Chief

*Dr. Biswajit Karmakar, Associate Professor, Depeart of Bengali, Hooghly Women's College.

ভূমিকা

হুগলি জেলার প্রথম মহিলা মহাবিদ্যালয় হল হুগলি ইউমেন্স কলেজ। আমাদের প্রিয় মহাবিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। দেখতে দেখতে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পচাঁত্তর বছর বয়েস হয়ে গেল। হুগলি চুঁচুড়ার অনেক ইতিহাসের সাক্ষী আমাদের মহাবিদ্যালয়। স্থানীয় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার কথা মাথায় রেখে মহাবিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। সেই আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের ছাত্রীরা সুনামের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। যখন প্রাক্তন ছাত্রীরা এসে বলে আমি এই মহাবিদ্যালয়ের লেখা পড়া করেছি, তখন গর্বে বুক ভরে যায়। একদিন এক বিরল অভিজ্ঞতা হল, আমার কক্ষে এসেছিলেন মহাবিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমানে তিনি গুজরাটে থাকেন। মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি অনেক স্মৃতিচারণ করলেন, ভালো লাগলো। আর মজাও পেলাম, যখন শুনলাম তিনি আমার থেকে বয়েসে বড়। এভাবেই তো ইতিহাস হয়ে যায় একটা প্রতিষ্ঠান। ইতিহাসের সাক্ষী তো বটেই আমাদের এই প্রতিষ্ঠান। মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তিসুধা ঘোষ। এটা আমাদের পরম প্রাপ্তি, অহংকারও বটে। পচাঁত্তর বছরকে মাথায় রেখে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছি। সারা বছর ধরে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। তার সঙ্গে পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনাও করেছি আমরা। পুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে "বীক্ষণ"। এই পুস্তকে বাংলা এবং ইংরেজিতে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন আমাদের এবং অন্যান্য কলেজের অধ্যাপিকা এবং অধ্যাপকেরা। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা, গবেষকরাও প্রবন্ধ লিখেছেন। ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। এছাড়া ধন্যবাদ জানাবো মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপিকা, অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মীদের। জানি সবাই প্রত্যক্ষভাবে থাকতে পারেননি এই প্রকাশনার কাজে। কিন্তু পরোক্ষ হলেও সবারই সহযোগিতা প্রয়োজন। ধন্যবাদ জানাই উপদেষ্টা মণ্ডলীকে এবং সম্পাদক মণ্ডলীকে। তাদের ছাড়া এই কাজটি সম্ভব হত না। কলেজের অগ্রগতির জন্য গবেষণামূলক লেখার খুব প্রয়োজন। আশাকরি আমাদের এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। যেকথা না বললেই নয়, সম্পাদক ডঃ বিশ্বজিৎ কর্মকারের নিরবচ্ছিন্ন শ্রমের ফসল এই বইটি। তাকে মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যক্ষা
ডঃ সীমা ব্যানার্জী

সম্পাদকীয়

আমাদের মহাবিদ্যালয় অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে। আমাদের এই ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান ইতিহাস বহন করে এগিয়ে চলেছে নিজের মহিমায়। হুগলী জেলার প্রথম মহাবিদ্যালয় শুধু তাই নয়, ১৯৫২ সালে নতুন ভবনের উদ্বোধনে এসেছিলেন সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষা শান্তিসুধা ঘোষ ছিলেন বিপ্লবী, একাধিকবার তাঁকে জেলে যেতেও হয়েছিল। আবার এম.এ. পড়বার সময় তিনি "ঈশান বৃত্তি' পেয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের নিয়ে তাঁর সময়ে যা চিন্তা ভাবনা করেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। "নারী" নামে একটি প্রবন্ধের বই লিখেছেন। আর নিজের নামের আগে "শ্রী" লিখতেন। একবার একটা অনুষ্ঠানে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে এসেছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

আমরা আমাদের এই মহাবিদ্যালয় নিয়ে গর্ব করি। জানি, দিন বদল হয়, সময় পাল্টে যায়, রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে দর্শনও যায় পাল্টে। এই পরিবর্তনের ধারায় একজন অধ্যাপিকা, অধ্যাপককে শুধু মহাবিদ্যালয়ে এসে পড়ালেই হবে না। তাঁদের অনেক অন্যরকম কাজ করতে হয়। তার সঙ্গে এসে পড়ে বিভিন্ন প্রকার গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা, যা মহাবিদ্যালয়ের মানকে বাড়াতে সাহায্য করে।

আমরা যারা বর্তমানে একসাথে কাজ করি, তারা ভবিষ্যতে এক দিন না এক দিন একসাথে থাকবো না। এই কর্মজগৎ থেকে অবসর নিতেই হবে। তাই যতদিন এক সাথে থাকি, আসুন না সবাই বেঁধে বেঁধে থাকি। এই বেঁধে থাকার জন্য সব থেকে বড় প্রয়োজন মহাবিদ্যালয় থেকে একটা নিয়মিত বই বা পত্রিকা প্রকাশ করা। যা সত্যি আমরা সম্ভব করতে পেরেছি। যেমন এই বর্তমান গ্রন্থে আমরা সদ্য অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপিকা সুলেখা রায়কে বেঁধে রাখতে পারলাম।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো অধ্যক্ষা ডঃ সীমা ব্যানার্জীকে। তবে যে কোন বই প্রকাশ করা একার কাজ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন অনেকে। অনেকে সামনে চলে আসেন, অনেকে থাকেন পিছনে। কিন্তু সবাইকে সমমূল্যে ধন্যবাদ জানাই। আর যাদের ছাড়া এই বইটি বাস্তবে কোন দিন প্রতিষ্ঠা পেত না, তারা হলেন উনিশ জন প্রাবন্ধিক। তাদের লেখা নিয়ে আমার কিছু বলবার নেই। সবাই অত্যন্ত সুন্দর

প্রবন্ধ লিখেছেন। যা আমাদের বইটিকে শ্রীবৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সবশেষে বলি, আমাকে সম্পাদক করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটা আমার কাজ নয়, আমাদের কাজ। কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতেই হত। যদি বইতে কোন ভুল থেকে থাকে, তার দায় আমার। তার জন্য আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বইটি পড়বেন। তাহলে আমার ত্রুটিকে লঘু মনে হবে। আশাকরি আমরা এর থেকেও ভালো কাজ ভবিষ্যতে করতে পারবো। ভালো থাকবেন সবাই।

সম্পাদক
ডঃ বিশ্বজিৎ কর্মকার

সূচিপত্র

দেশীয় উচ্চ শিক্ষা চর্চায় সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী
সুলেখা রায় ১১
Lost Threads: Examining the Role of Rural Women in the Textile Industryand Its Impacton Culture and Heritage in 19thto Early 20thCentury Bengal
Dr. Barnali Chattopadhyay ২১
"Euthanasia: Some Analytical Views"
Dr. Suchismita Ghosh Hazra ৩২
বিশ্বপরিবেশ সংরক্ষণ ও সুস্থ সমাজ সংগঠনে জৈনধর্মের অবদান
সুস্মিতা ঘোষ ৩৮
উপনিষদ শিক্ষার লক্ষ্য ও মানবধর্ম
ডঃ জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সবুজ দ্বীপের রাজা' : এক অনন্য সৃষ্টি
ড. নির্মাল্য সেনশর্মা ৫১
সাংখ্য ও যোগ সম্প্রদায়ের আধিবিদ্যক আলোচনায় ঈশ্বরের ভূমিকা; একটি সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা
দেবেশ মুদি ৬৩
আধুনিক যুগে পুরুষার্থ
অনিমেশ সরকার ৭৫
Embracing Diversity: Unveiling the Intersex Community in Ancient Indian Mythology
Balaka Halder ৮০
A review on Presage Biology: role of indigenous folk cultures
Sujata Roy Moulik & Sumit Chakraborty ৯২
Reading Samhita Arni's The Missing Queen as a Critique of "India Shining"
Dr. Somrita Dey (Mondal) ১০৩
The Development Rhetoric: A Cosmetic Cover
Sunandita Sarker ১১৪
The Changing Trends of Economic Indicators
Sohini Nath ১২৪

Title of the Paper – National Education Policy 2020 and Student DevelopmentScenario in India
Dr.Amrita Bhattacharyya ১৩১
Unveiling the Layers of Knowledge: A Critical Assessment of Locke's Epistemology
Biswajit Pasman ১৩৭
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় স্বপ্ন এবং বাস্তবতা
বিশ্বজিৎ কর্মকার ১৪৭
Myth versus Reality: A Brief Assessment of Feminist Revisionist Mythology in Margaret Atwood's Select Poems from The Snake Poems Series.
Adrija Santra ১৫৫
Fuzzy-Rough set approach for Data Modelling
Pallab kumar Dey ১৬৪
Adsorption of RhB dye using the ash of printed waste paper: A useless hazardous material used to remove other
Forkan E Aman ১৭৭
Hindu Class System and Culture: An Aurobindonian View
Dr. Indrani Sen ১৮৯

লেখক পরিচিতি ২০৩

দেশীয় উচ্চ শিক্ষা চর্চায় সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী
[প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্ব ।]
সুলেখা রায়

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় ,মধ্যযুগে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, শিল্প স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। বর্তমান আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয় যে মধ্যযুগে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি ছিল না,অথবা এমন কোন সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না,যাকে প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় ।এ কারণে আলোচ্য সময়ের বিদ্যাচর্চা সম্পর্কিত ধারণা লাভের জন্য অঞ্চল ভিত্তিক আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলায় প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় 1835 ও 1838 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অ্যাডামের প্রতিবেদনে। আলোচ্য বিষয় সূত্রে ঐ প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশ, "There are three kinds of colleges in Bengal - one in which chiefly grammar, general literature and rhetoric and occasionally the great mythological poems and law are thought, a second in which chiefly law and sometimes mythological poems are studied, and a third in which logic is made the principal object of attention."[১] অ্যাডাম এক্ষেত্রে কলেজ বলতে নিঃসন্দেহে চতুষ্পাঠী গুলিকেই বুঝিয়েছেন।

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায় সাধারণ ভাবে এক একটি চতুষ্পাঠীতে এক একজন অধ্যাপক বিশেষ একটি বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। সুতরাং এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুযায়ী অধ্যাপকের নিকট বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার সুযোগ পেতেন। এ সময় বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার সুবিধা সমন্বিত সংহত রূপ যে সকল অঞ্চলে দৃষ্টিগ্রাহ্য হত,- সেই স্থানগুলি 'বিদ্যাসমাজ' অভিধায় আখ্যায়িত হত ।

এইরূপ বিদ্যাসমাজের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য একটি বিদ্যাসমাজের স্বীকৃতি অর্জন করেছিল ত্রিবেণী ।সপ্তগ্রাম ও বাঁশবেড়িয়া ছিল এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ভুক্ত । বিদ্যাস্থান রূপে ত্রিবেণীর স্বীকৃতির বহু উল্লেখ পাওয়া.যায় ।উদাহরণ হিসাবে ও ধারণা স্পষ্টীকরণের জন্য দু-একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন-1791 খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় লেখা হয়, "Tribeni was one of the four 'Sa-

maj' or places famous for Hindu learning ; the others are Nadia, Santipur and Guptipara."[2] আবার ঊনবিংশ শতকের সূচনায় ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে লেখেন, "Almost every town in Bengal contains some Nyayayika schools ,though they are most numerous at Nudeeya ,Triveni and Vansvariya."[3]

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রচিত বাঙলা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর সগৌরব উল্লেখ পাওয়া যায় । এক্ষেত্রে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত, বাসুঘোষের কড়চা উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্মার্ত রঘুনন্দন বিরচিত প্রায়শ্চিত্তত্ত্ব নামক স্মৃতি গ্রন্থ। স্মার্তপ্রবর ত্রিবেণীর তীর্থ গৌরব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মহাভারতে বলা হইয়াছে,'প্রদ্যুম্ননগর হইতে দক্ষিণে এবং সরস্বতীর উত্তরস্থিত স্থানের নাম দক্ষিণ প্রয়াগ। এইখান হইতে গঙ্গাকে ছাড়িয়া যমুনা চলিয়া গিয়াছে ।এই দক্ষিণ প্রয়াগে স্নান করিলে প্রয়াগে স্নান করিবার ন্যায় অক্ষয় পূণ্য লাভ হইয়া থাকে ।'এই দক্ষিণ প্রয়াগকেই 'উন্মুক্ত বেণী' বলা হয়,এবং উহা সপ্তগ্রাম নামক নগরের দক্ষিণ দেশে 'ত্রিবেণী' নামে প্রসিদ্ধ।"[4] -উদ্ধৃত বর্ণনার প্রতিপাদ্য বিষয়ের দুটি দিক লক্ষণীয় :- ক) মহাভারতের উল্লেখ করে বক্তব্য বিষয়ের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস।

খ) ত্রিবেণী যথেষ্ট প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্থানটির অবস্থান বোঝানোর জন্য সপ্তগ্রামের মতো বানিজ্য নগরীর উল্লেখ।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও (রচনা কাল-1535 খ্রিস্টাব্দ) সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী একত্রে এবং পবিত্র স্থান রূপে বর্ণিত-

"সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম ।।"[5]

বস্তুত পঞ্চদশ শতক থেকেই বাংলা সাহিত্যে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর মহিমা কীর্তনের উদাহরণ যথেষ্ট, যা থেকে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সম্পর্কিত ধারণা হলেও, উচ্চ বিদ্যাচর্চার বর্ণনা পাওয়া যায় না । সে কারণে এই বিষয়ে ধারণা গঠনের জন্য প্রয়োজন হল আলোচ্য অঞ্চলে চতুষ্পাঠীর অনুসন্ধান, তৎসহ শিক্ষার বিষয়বস্তু,অধ্যাপকদের পরিচয় গ্রন্থ ও গ্রন্থ রচয়িতা সম্বন্ধীয় তথ্য পর্যালোচনা ।

মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাণিজ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী অঞ্চলের উল্লেখ প্রচুর। মঙ্গল কাব্য রচয়িতাগণের মধ্যে অন্তত দুই জনের জন্মস্থান ছিল এই অঞ্চল। এঁরা হলেন গৌরীমঙ্গল রচয়িতা শঙ্কর কিঙ্কর মিশ্র, এবং শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল রচয়িতা মাধব আচার্য। মাধব আচার্যের পিতা পরাশরও পন্ডিত মহলে সুপরিচিত ছিলেন, গ্রন্থ

মধ্যে তাঁর পরিচিতি এই রূপ, -

"পরাশর নামে দ্বিজ কুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার। ।"[৬]

বলাবাহুল্য যে এরূপ কাব্য রচনা নিয়মিত উচ্চ মানের শিক্ষা চর্চার অস্তিত্বের প্রমাণ। মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ এবং চৈতন্য জীবনীর লেখকগণ সপ্তগ্রামের বর্ণনায় বাণিজ্যের উল্লেখ সহ যে ভাবে বারংবার এই অঞ্চলকে 'সপ্তঋষির বাসস্থান 'বলে গুণ কীর্তন করেছেন, তা থেকে কেবল বাণিজ্য কেন্দ্র নয় ,সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হিসাবেও এ অঞ্চলের স্বীকৃতি ছিল এমন অনুমান সংগত ভাবে করা চলে । তাছাড়া ধনী বণিকগণ তাঁদের সম্পদের কিছু অংশ বিদ্যাচর্চার উন্নতি কল্পে ব্যায় করতেন এমন ধারণাও সংগত। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় ।উক্ত গ্রন্থে সপ্তগ্রামের রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারী হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসের সভার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ,-"অনেক পন্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন ।

দুই ভাই মহা পন্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন ।।"[৭]

এভাবেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ সপ্তগ্রামের শাসনাধিকারী দুই ভাইকে পন্ডিত ও বিদ্বৎজনের পৃষ্ঠপোষক রূপে বর্ণনা করেছেন।

এই সূত্রে বিশেষ ভাবে আলোচ্য ব্যক্তি অবশ্যই গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথ দাস,যিনি ছিলেন বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম ও বহু গ্রন্থ রচয়িতা । সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে তিনি সপ্তগ্রামেই বসবাস করতেন। তাঁর শিক্ষার মান অবশ্যই উচ্চ ছিল। রঘুনাথ দাসের দুই জন শিক্ষকের নাম জানা যায়,এঁরা হলেন বলরাম আচার্য ও যদুনন্দন আচার্য। শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলরাম আচার্যের উল্লেখ এই প্রকার,

"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিঞা রহিলা বলরাম আচার্যের ঘরে।।
হিরণ্য গোবর্ধন দুই মুলুকের মজুমদার।
তার পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর ।।
হরিদাসের কৃপা পাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে ।।
নির্জন পর্ণশালায় করেন কীর্তন।
বলরাম আচার্য গৃহে ভিক্ষা নির্বাহন ।।
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করে দরশন ।।"[৮]

উদ্ধৃতাংশের যে বক্তব্যগুলি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক সেগুলি হল :-

১. বলরাম আচার্য নিজ গৃহে অধ্যাপনা করতেন।

২. সপ্তগ্রামের মজুমদারের পুত্র তাঁর কাছে অধ্যয়ন করতেন।

ইনি পৌরহিত্যও করতেন।

৩. ইনি অতিথি পরায়ন সচ্ছল গৃহস্থ ছিলেন।

শ্রী তারকব্রহ্ম দাস তাঁর রচিত শ্রীবৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন বলরাম আচার্য ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর শিষ্য। -এই মত যথার্থ হলে, সিদ্ধান্ত করা যায় যে বলরাম আচার্য উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, কেননা অদৈত্ব আচার্য উচ্চ শিক্ষা দান করতেন। রঘুনাথের আরও একজন গুরুর নাম জানা যায়,-ইনি হলেন শ্রীযদুনন্দন তর্কচূড়ামণি । কবি কর্ণপুর রচিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় (10/3) নাটকে এঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে,-

" আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেব প্রিয়ঃ

তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্ ।।"[9]

অর্থাৎ শ্রী বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রিয় পাত্র অতি সুমধুর মূর্তি শ্রী যদুনন্দন আচার্য, তাঁরই প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ, নিজ গুণে তিনি আমাদের সকলেরই প্রিয় । প্রেমবিলাস অনুসারে ইনি ছিলেন হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধনদাস -পরিবারের কুলগুরু ।[10] চৈতন্য চরিতামৃত অনুসারে ইনি অদ্বৈত শাখা;- "শ্রী যদুনন্দনাচার্য অদ্বৈতের শাখা ।

তার শাখা উপশাখাগণে নাহি লেখা ।।"[11]

এঁর আচার্য উপাধি ও বহু শাখার উল্লেখ থেকে এই অনুমান সংগত যে ইনি বিদ্যা চর্চা করতেন ও তাঁর বহু শিষ্যাদি ছিল। তাঁর এই শিষ্য বর্গের মধ্যে রঘুনাথ দাস অবশ্যই অতি উজ্জ্বল ব্যক্তি । সংস্কৃত ভাষায় রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দক্ষতা তর্কাতীত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল:- মুক্তাচরিত্র ,দানকেলিচিন্তামণি ,স্তবাবলী। উক্ত গ্রন্থ গুলি সবই তাঁর বৃন্দাবন বাসকালীন রচনা ,কিন্ত লক্ষ্যণীয় বিষয় হল গ্রন্থ রচনাকালে তিনি পূর্বাশ্রমের গুরুকে স্মরণ করেছেন। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে," মুক্তাচরিত্রের চতুর্থ শ্লোকে দাসগোস্বামী নিজের গুরুকে (যদুনন্দন আচার্য) প্রণাম করে বলেছেন, - যাঁহার সুবিখ্যাত কৃপায় নাম শ্রেষ্ঠ হরিনাম, শচীপুত্র,স্বরূপ,রূপ,সনাতন, মথুরাপুরী ,গোষ্ঠবাটী,রাধাকুন্ড ,গিরিগোবর্দ্ধন ,ও শ্রীরাধামাধবের আশা পাইয়াছি সেই গুরুদেবকে প্রণাম। "--এইভাবে রঘুনাথদাস সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে সুনিশ্চিত হওয়া যায় সপ্তগ্রাম অঞ্চলে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার মান যথেষ্ট উঁচু ছিল ষোড়শ শতক। থেকেই, কেননা তিনি সপ্তগ্রাম ভিন্ন অন্য কোন সমকালীন বিদ্যাসমাজে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি ।

ষোড়শ শতকে আবির্ভূত আরও দুই জন গ্রন্থকারের নাম জানা যায়,

যাঁরা নিত্যানন্দপুরের (কুন্তীঘাট) বাসিন্দা ছিলেন । এঁরা হলেন শ্রীধর ও বাণীনাথ । এই দুজন ছিলেন নিত্যানন্দের সাক্ষাত শিষ্য এবং জাতিতে সুবর্ণ বণিক। শ্রীধর রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পটল' এবং বাণীনাথ রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীনিত্যানন্দ-চৌতিশা।' অবশ্য এই গ্রন্থ দুটি অদ্যাপি পাওয়া যায় নি ।

উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকেই সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী অঞ্চলে বিদ্যাচর্চা চলত ,যার মান ছিল যথেষ্ট উচ্চ, কিন্ত এ পর্যন্ত বিদ্যাচর্চার নিয়মিত রূপ সম্বন্ধে তথ্য সুলভ নয় । এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যে চতুষ্পাঠী কেন্দ্রিক সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক উচ্চ বিদ্যাচর্চার সংবাদ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতক থেকে । বিশ্বকোষে *[13] ত্রিবেণী সম্পর্কে বলা হয়েছে, এক সময় ত্রিবেণীতে ত্রিশটি টোল ছিল। অবশ্য এখানে 'এক সময়' বলতে কোন সময় তা নির্দেশিত হয় নি ।অষ্টাদশ শতকে ত্রিবেণী সংস্কৃত চর্চার অন্যতম পীঠস্থান রূপে স্বীকৃত ছিল। এই স্বীকৃতি ও খ্যাতির প্রধানতম কারণ ছিল জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রতিভা এবং সে সম্পর্কে ঔপনিবেশিক প্রশাসক ও পন্ডিতজনের সচেতনতা। বলাবাহুল্য এরূপ প্রতিভার আবির্ভাবের একটি প্রেক্ষাপট ছিল। তবে চতুষ্পাঠী ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র রূপে আলোচ্য অঞ্চলের আত্মপ্রকাশ কিভাবে ও কোন সময় ঘটেছিল, সে বিষয়ে তথ্যের অভাব আছে । উক্ত বিষয়ে আলোচনা ও ধারণা গঠনের জন্য জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের পূর্ব পুরুষগণের গ্রন্থ রচনা ও শিক্ষাদানে সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে ।

'বিবাদভঙ্গার্ণব'-এর পুষ্পিকা*[14] অনুসারে জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের পিতার নাম ছিল শ্রী রুদ্র তর্কবাগীশ ।রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার ।ভবদেব রচিত 'তিথিকলা' নামক প্রকরণের শেষে তাঁর উর্দ্ধতন তিন পুরুষের নামের উল্লেখ আছে ।এঁরা হলেন :-গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ ,শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন ,হরিহর তর্কালঙ্কার । হরিহরের দুই পুত্র পূর্বোল্লিখিত ভবদেব ও রুদ্রদেব ।

ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের সক্রিয়তার কাল হিসাবে 1719 -29 খ্রিস্টাব্দ (1641-51 শক) সময় চিহ্নিত করা গেছে।এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় তাঁর প্রপিতামহ ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন,এবং সেক্ষেত্রে এই কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় তিনি নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দনের সমসাময়িক ছিলেন। ভবদেবের উল্লেখ অনুযায়ী গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ ষড়দর্শন,শৈবসিদ্ধান্ত ,পুরান, মহাভারত ও চতুর্বেদে নিপুন ছিলেন। লক্ষ্যণীয় সমকালে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে চর্চার দুই বিষয় নব্য স্মৃতি ,ও নব্য ন্যায়ের উল্লেখ ভবদেব এই করেন নি ।পিতামহ

শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন সম্বন্ধে ভবদেবের বক্তব্য হল তিনিও তাঁর পিতার মতই পন্ডিত ছিলেন। 'ন্যায়পঞ্চানন' এই উপাধি প্রমাণ করে তিনি ন্যায়শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন । কিন্ত তিনি কার কাছে ন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় না । তবে মনে হয় ,এ সময় পর্যন্ত ত্রিবেণী ন্যায় শাস্ত্রে উপাধি দানের অধিকার অর্জন করেনি । শিবকৃষ্ণের পুত্র হরিহর তর্কালঙ্কার ন্যায় শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন, যিনি ন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করেন নবদ্বীপে, মথুরানাথ তর্কবাগীশের (ষোড়শ শতকের শেষার্ধ)কাছে। হরিহর তর্কালঙ্কার গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন। অবশ্য তাঁর রচিত গ্রন্থের মাত্র চারটি পত্র অদ্যাপি পাওয়া গেছে (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, পুঁথি সংখ্যা-897)। প্রাপ্ত পত্রে তাঁর পিতা এবং গুরুর নামের উল্লেখ আছে। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মতে, এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয়ের সার সংকলন। হরিহর তর্কালঙ্কার নিজ গুরু মথুরানাথের মতোই রঘুনাথ শিরোমণির মত লিপিবদ্ধ করেছেন। হরিহরের গ্রন্থ রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ।

ত্রিবেণী বিদ্যাসমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার। তাঁর সময়কাল সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগ। ভবদেবের চতুষ্পাঠী ছিল বাঁশবেড়িয়াতে ।চতুষ্পাঠী চালানোর ব্যাপারে তিনি স্থানীয় ভূম্যধিকারীর সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থের নাম জানা যায় :-স্মৃতিচন্দ্র , তীর্থসার ,ও নবগ্রহযোগ পদ্ধতি ।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ (সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগ) কয়েকটি কাব্য ও নাটকের টীকাকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত যে টীকা গুলি পাওয়া গেছে,সেগুলি হল:- শকুন্তলা,নৈষধ এবং প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টীকা। তাঁর রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টীকা বহুল প্রচারিত ছিল। 'রুদ্রী' নামে বিখ্যাত এই টীকা গ্রন্থের প্রতিলিপি সমকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপেও পাওয়া গেছে ।

সুবিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (1694-1807 খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন রুদ্রদেব তর্কবাগীশের সন্তান। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁর জন্ম দিন নির্দ্ধারণ করেছেন-1698 খ্রিস্টাব্দ, 13th সেপ্টেম্বর *[16] জগন্নাথ তাঁর জেষ্ঠ্য তাত ভবদেবের বাঁশবেড়িয়া স্থিত চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন। ভবদেবের মৃত্যুর পর তিনি ত্রিবেণীতে রঘুদেব বাচস্পতির চতুষ্পাঠীতে যোগ দান করেন।

রঘুদেব ছিলেন কামালপুরের ভট্টাচার্য্য বংশের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। তাঁর মতো খ্যাতিমান নৈয়ায়িক কি কারণে কামালপুর ছেড়ে ত্রিবেণীতে টোল স্থাপন করেন, সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না । এক্ষেত্রে

সম্ভাব্য দুটি কারণ এই রূপ :- ক) ত্রিবেণীতে অধিক সংখ্যক ও উন্নত মানের ছাত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা, 2) ত্রিবেণীর বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের আহ্বান ও পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে এ ব্যাপারে প্রণোদিত করেছিল। জগন্নাথ ত্রিবেণীতে গুরুর কাছ থেকে তর্কপঞ্চানন উপাধি লাভ করেন। সুতরাং এ সময় ত্রিবেণী তর্ক শাস্ত্রে উপাধি দানের অধিকারী ছিল, এবং বাংলার বিদ্যাসমাজ গুলির মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য স্থান লাভ করেছিল একথা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় ।

উপাধি প্রাপ্তির পর জগন্নাথ ত্রিবেণীতে টোল স্থাপন। অধ্যাপক হিসাবে তাঁর খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ।প্রধানত ন্যায়ের অধ্যাপনা করলেও তাঁর চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি,পুরান, তন্ত্র, অলঙ্কার, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয়েও পাঠ দান করা হত । এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম ওয়ার্ডের বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য ," At Triveni about 28 miles north of Calcutta, is a large chauvaree , where a Brahmun named Jagunnath'hu Tarkupanchannu presides .He knows a little of the Vedas,and, it is said, he has studied the Vedanta ,Shankhya ,Patanjulu, the Naya,Smrittee, tuntru,Ulunkara,Kalyan,Puranu,and other santra."[17]

জগন্নাথের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন, -মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র , নবকৃষ্ণ বাহাদুর, মহারাজা নন্দকুমার ,আলিবর্দী,মীরজাফর ,বর্ধমান রাজ ত্রিলোকচন্দ্র প্রভৃতি ।তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন উইলিয়াম জোন্স । জোন্স-এর ভাষায় তিনি ছিলেন, "the most learned of the native law years."[18] জোন্সের বিশেষ অনুরোধে তিনি 'বিবাদভঙ্গার্ণব ' রচনা করেন। এটি

হিন্দুদের ব্যবহার শাস্ত্র। এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি পাওয়া গেছে রাজা রাধাকান্তদেবের গ্রন্থাগারে ,যেটির পৃষ্ঠা সংখ্যা 970 ।এই বিশাল গ্রন্থ রচনা করতে সময় লেগেছিল চার বছর (1788-92)। এই সংকলন গ্রন্থের মুখবন্ধে জগন্নাথ উল্লেখ করেছেন, "আমি রুদ্রের পুত্র জগন্নাথ দেশের আইন রক্ষাকর্তার নির্দেশে এই গ্রন্থ সংকলিত করলাম। দৃঢ় ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পন্ডিত রাধাকান্ত, গুরুপ্রসাদ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী ছাত্রবৃন্দ রামমোহন, রামনিধি ,ঘনশ্যাম ও গঙ্গাধর এই সংকলনের কাজ সমাপ্ত করতে প্রভূত সাহায্য করেছেন।"[19] -পরবর্তী কালে কোলব্রুক চার খন্ডে জগন্নাথের সংকলনটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। এই বই সম্পর্কে সরকারের ঔৎসুক্য ছিল খুব বেশি, যার প্রমাণ হল এটির 300 কপি কলকাতার সরকারী প্রেসে ছাপার ব্যবস্থাপনা। অবশ্য এর কিছুদিনের মধ্যেই 'কর্ণওয়ালিশ কোড' কার্যকরী হয়, ফলে এই গ্রন্থটির

প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়।

আলোচ্য অঞ্চলে প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বে বিদ্যাচর্চা সম্পর্কিত আলোচনায় আরও কয়েক জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন:- চন্দ্রশেখর বাচস্পতি,রঘুদেব বাচস্পতি এবং রাঘবেন্দ্র তর্কালঙ্কার। কারও কারও মতে চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ছিলেন জগন্নাথের পিতামহ হরিহর তর্কালঙ্কারের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা ।কিন্ত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার তাঁর গ্রন্থে যে বংশ পরিচয় দিয়েছেন তাতে চন্দ্রশেখর বাচস্পতির নাম নেই। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠ তাত চন্দ্রশেখর বাচস্পতি সমগ্র বঙ্গদেশে একজন শ্রেষ্ঠ স্মার্ত ছিলেন-তাঁহার নিবন্ধের নাম স্মৃতিসার সংগ্রহ, দ্বৈতনির্ণয় ও মীমাংসাশাস্ত্রে ধর্মদীপিকা।"[20] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা গ্রন্থ অনুসারে জানা যায় উল্লিখিত নিবন্ধগুলির লেখকের নাম চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য, যিনি বাচস্পতি উপাধিধারী ছিলেন এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলের সন্তান ছিলেন।[21] কিন্ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নিজ বংশ পরিচয় দিয়েছেন রাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্র পালধি গাঞী । অন্য একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আলোচ্য সময়কালে ত্রিবেণী সন্নিহিত নিত্যানন্দপুরে চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নামে একজন স্মার্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নি:সন্দেহ হওয়া যায়।কেননা এই নামধারী একজন স্মার্তকে এই সময় জমি দান করেছিলেন সরফরাজ খান।[22] উমাচরণ ভট্টাচার্য্য বর্ণিত কাহিনী অনুসারে নিত্যানন্দপুর নিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ঙ্গ চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ছিলেন রুদ্রদেব তর্কবাগীশের চির সুহৃদ, যাঁর চতুষ্পাঠী ছিল ত্রিবেণীর পূর্ব পল্লীতে । প্রাপ্ত এই সকল তথ্য থেকে এরূপ ধারণা হয় যে চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পূর্ববর্তী একজন প্রতিভাবান পন্ডিত, যাঁর চতুষ্পাঠী ছিল ত্রিবেণীতে,তিনি নিবন্ধ রচয়িতা ছিলেন এবং পারিবারিক সৌহার্দ্য -এর সূত্রে তাঁর জেষ্ঠ্য তাত-এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন ।

রঘুদেব বাচস্পতি ও রাঘবেন্দ্র তর্কালঙ্কার কামালপুরের বিখ্যাত পন্ডিত বংশের সন্তান। রঘুদেবের পিতা মধুসূদন পঞ্চানন ,ভ্রাতা বাসুদেব বিদ্যালঙ্কার নদীয়া রাজের দানভাজন ছিলেন। রঘুদেব ত্রিবেণীতে চতুষ্পাঠী করেন। তাঁর চতুষ্পাঠীতে জগন্নাথ দশ বছর অধ্যয়ন করেছিলেন। রঘুদেবের পুত্র পৌত্রেরও পান্ডিত্য খ্যাতি ছিল। মধুসূদন পঞ্চাননের ভ্রাতা সিদ্ধেশ্বর সার্বভৌমের পৌত্র ছিলেন রাঘবেন্দ্র তর্কালঙ্কার। ইনিও ত্রিবেণীতে টোল করেন। রাঘবেন্দ্রের পাঁচ পুত্রও নৈয়ায়িক হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। এঁরা হলেন:-রাজবল্লভ ন্যায় বাচস্পতি, কামদেব বিদ্যা বাচস্পতি,লোকনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত, জগন্নাথ ন্যায়পঞ্চানন, ও বলরাম তর্ক ভূষণ ।উল্লিখিত পন্ডিত বর্গের নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল ভাটপাড়া,শিবপুর, কেওটা প্রভৃতি স্থানে ।

প্রাপ্ত এই সকল তথ্য থেকে সুনিশ্চিত ভাবে যে ধারণা স্পষ্ট হয়, তা হল ত্রিবেণী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে উচ্চ বিদ্যাচর্চার ধারা বেগবতী হয়েছিল ও বেশ কিছুকাল সজীব ছিল। একারণেই বাঙলায় প্রাক্ ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক পর্বের প্রথম দিকের দিন গুলির শিক্ষাচর্চার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের বিদ্যাচর্চার কথা অবশ্য আলোচ্য।

তথ্যসূত্র

1)William Adam, Report on the state of Education in Bengal 1835 &1838,edited by A.Basu.C.U. 1941,P.18

2)দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দে'জ 1993 ,

পৃ:345

3)W.Ward ,A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos ,Vol.2,Lo,1822,P.226

4)প্রায়শ্চিত্তত্বত্ত্বম্ ,হৃষিকেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলিকাতা,1335 সাল,পৃ:177

5)চৈতন্য ভাগবত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমি,1991,পৃ: 298

6)আশুতোষ ভট্টাচার্য, মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ,এ.মুখার্জ্জী অ্যান্ড কোং,1368 পৃ:464

7)চৈতন্য চরিতামৃত, সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ, অন্ত/তৃতীয়

8) ঐ

9) শ্রী তারকব্রহ্ম দাস, শ্রীবৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী, শ্রীধাম মায়াপুর ,পৃ:409

10)গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, নবদ্বীপ, 501চৈতন্যাব্দ ,পৃ:1310

11) চৈতন্য চরিতামৃত, আদি/দ্বাদশ

12)বিমানবিহারী মজুমদার, চৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ:115

13)বিশ্বকোষ, বিংশ ভাগ,কলকাতা,1316বঙ্গাব্দ

14)দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বঙ্গে নব্য ন্যায় চর্চা,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,চৈত্র, 1358,পৃ:228

15)শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী,কলকাতা,1368 বঙ্গাব্দ, পৃ:28

16)বঙ্গে নব্য ন্যায় চর্চা,পৃ:227-28

17)W.Ward,A view of the History, Literature and Religion of the Hindus,1811,P. 200

18) Nandini Bhattacharya-Panda,Hindu Law in Colonial Bengal, O.U.P.,2008,P.205
19)পূর্ণেন্দুনাথ নাথ,জজ পন্ডিতদের কথা,পুস্তক বিপণি,2004,পৃ: 23
20) বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রকাশ ভবন, পৃ:309
21)স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী, পৃ: 26
22)নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হুগলী জেলার পুরাকীর্তি ,প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ:88

Lost Threads: Examining the Role of Rural Women in the Textile Industry and Its Impact on Culture and Heritage in 19th to Early 20th Century Bengal

Dr. Barnali Chattopadhyay

Weaving, as a pervasive traditional occupation across India, predominantly thrived in rural areas, serving as a domestic industry. Cotton emerged as the prevalent material in the fabric production process, "of this a great deal is freed from the seed by the women who spin it, and a part of this is also beaten by the same persons". According to Nirmala Banerjee, Bengal's women were renowned for their expertise in cotton spinning, and until the early 19th century, Dhaka Muslins were globally acknowledged for their exceptionally fine yarn. The spinning endeavor employed a considerable workforce, as evidenced by the presence of five to six spinning wheels in affluent households within cotton manufacturing regions. Buchanan's observations shed light on the role of professional Dhuniyas, who undertook the tasks of cleaning, beating, and seed separation for cotton. While a portion of these Dhuniyas possessed sufficient capital to purchase cotton for cleaning and retailing, the majority worked exclusively on a contractual basis. On average, a married couple could earn between 3 to 4 rupees per month from their spinning activities.

The city of Dhaka gained renown as a prominent center for muslin production. During the first half of the nineteenth century, Dumroy, a town situated approximately twenty miles west of Dhaka along the Bunsi River, emerged as a significant hub. The majority of Dumroy's inhabitants were Hindus, and a notable portion of the town's 400 houses belonged to weavers who specialized in supplying the exquisite thread required for the Dhaka looms.

Weaving activities were prevalent across numerous villages in

the Dhaka region. In addition to Dhaka itself, other notable manufacturing towns (aurung) included Sonargaon, Dumroy, Teetabaddy, Junglebarry, and Bazitpur, where the production of muslins thrived. The moist and damp climate of Dhaka proved highly conducive to the manufacturing process of muslin, whereas the dry and arid atmosphere of Birbhum was better suited for the production of coarse calico fabrics.

The production of muslin necessitated the utilization of delicate fingers to handle the yarn. Typically, young women engaged in spinning this yarn during the early morning hours, specifically "before the dew disappeared from the ground." In the region of Dacca, the manufacturing process of muslin was heavily influenced by atmospheric conditions. Cotton freshly harvested possessed a notable level of moisture, which proved beneficial for the softness of the yarn required for muslin production. However, if left exposed for a duration of two to three months, the cotton would gradually lose its moisture, resulting in a harder texture suitable for weaving fine cloth. Conversely, coarse thread was exclusively crafted from fresh cotton, which was entirely unsuitable for the production of delicate fabrics.

During the months of September and October, fresh cotton thread would enter the market, while the delicate yarn, requiring the drying period to draw out fine threads from the cotton, would be available for sale two to three months later. This refined thread would typically reach the market between December and March, occasionally extending into the initial weeks of April. It is worth noting that a significant number of spinners had tragically perished during the famine of 1788, leading to a shortage of skilled spinners. As a result, many spinners preferred to focus on spinning coarse cotton thread, as they allocated their time primarily to afternoon spinning sessions, which were not the most conducive hours for producing fine thread.

The spinning industry exhibited two prominent characteristics that are worth noting. Firstly, it was predominantly monopolized by women, and secondly, it was not restricted to a particular caste

or social group. Even women from the highest castes actively participated in spinning activities. The spinning of thread for cloth production served as a part-time occupation for women across all classes in Bengal, regardless of their caste. The preparation of cotton thread occupied the leisure hours of women belonging to higher castes, including Brahmin women and the wives of jugis (menial workers) and cultivators. As described in Martin's book on the history, topography, antiquities, and culture of Eastern India, almost every woman, except those involved in trade, engaged in spinning. In ancient India, it was customary for women within each household to carry out their own spinning tasks, with widows particularly playing a significant role. This practice persisted in Bengal as late as 1914.

Despite being a part-time domestic endeavor, spinning was highly labor-intensive. The production of small quantities of thread required diligent effort, as women could only allocate a limited number of hours due to their various domestic responsibilities.

The process of spinning necessitated the utilization of two key instruments: the "charka" or spinning wheel, which primarily produced coarse yarn, and the "takwa" or spindle, which served to refine the yarn. Both these instruments played a fundamental role in supplying thread for the majority of manufactured goods. N. K. Sinha elucidated that the finest varieties of thread were crafted using the spindle, while the wheel was employed for the production of coarser thread. Due to the nature of spinning being interwoven with domestic tasks, the resulting thread was produced at a lower cost compared to other commodities that required manual skill.

During the spinning process, the spinner would grasp the cocoon and pinch it to extract the filament. The thread was then wound onto a bamboo frame known as "latai," which was held by the right hand. The cocoons were positioned on the left side of the spinner, with the thread passing over the right thigh. Before being wound onto the latai, the thread was twisted by the left hand. On average, women managed to weave approximately two seer of

yarn in a month, showcasing their dedication and productivity in this endeavor.

The primary contributors to the spinning industry were the wives of farmers, who undertook the task of freeing the cotton from its seeds using a common hand mill. Subsequently, they beat the cotton with the assistance of a bow and spun the fibers using a small wheel, which, according to Martin, was a rudimentary and unsatisfactory tool. In fact, all the implements employed throughout the spinning processes were deemed "extremely imperfect" by Martin. The rural women, lacking access to advanced technology, had to rely on traditional methods due to this technological disparity. Nirmala Banerjee noted that the women's skills were developed in an environment lacking proper tools, leading to detrimental effects on their physical well-being. The spinners involved in producing the finest Dacca muslins invariably suffered from deteriorating eyesight by the age of thirty. Hameeda Hossain also remarked on the constraints faced by women due to the decline in their capacity for this work after the age of thirty, primarily due to the strain placed on their eyes from spinning activities.

Furthermore, a small number of economically disadvantaged Brahmin women engaged in preparing the fiber from country cotton (kapas) and spun it to create "paita," the sacred thread worn by Brahmins.

Estimating the exact number of individuals involved in spinning, dyeing, and related activities during the nineteenth century is a challenging task, primarily due to the absence of regular census records. However, Buchanan conducted a survey of Bihar and Patna in 1811-12, shedding some light on the matter. According to his findings, women, comprising approximately one-fifth of the population, were engaged in spinning, with an estimated count of 330,426 individuals. The annual value of the thread produced by each spinner amounted to 7 rupees, 2 anna, and 8 pice, resulting in a total annual value of Rs. 23,67,277. Considering that the raw material cost at the retail price reached Rs. 12,86,272, this left a profit of Rs. 10,81,005, equating to approximately Rs. 3¼ per

spinner.

In another account provided by Buchanan, he mentioned the probable income of the spinners of Shahabad. Their total count slightly exceeded 1,59,500, and the average annual value of their produce was approximately Rs. 8. After deducting the value of the raw material and the cost of beating, each spinner earned an average of around a rupee and a half per year.

These figures provide a glimpse into the economic aspects of the spinning industry during that period, highlighting the profitability for individual spinners and the overall value generated by their labor.

This particular statement serves to emphasize the meager earnings of spinners. However, it is important to consider two significant factors. Firstly, the districts mentioned earlier only present a partial view rather than a comprehensive picture of the spinners in Bengal. Secondly, the majority of spinners were housewives, limiting their spinning activities to their spare time, which often amounted to only a few hours in the afternoon. It is undeniable that the earnings were indeed small; nevertheless, they undoubtedly added some value to their families' livelihoods.

In addition to these part-time spinners, there existed a select few professional spinners who dedicated long hours each day to spinning, particularly when working with fine thread. However, the demand for fine thread in Bengal diminished during the latter half of the eighteenth century. To incentivize spinners, the Commercial Resident of Sonamukhi even offered a small premium to those who could bring sufficient quantities of fine thread to the market.

The price that spinners received for their high-quality yarn often did not adequately compensate them for their labor. As a result, many spinners showed a preference for spinning coarse cotton, as it was more commonly used for domestic consumption and fetched a satisfactory price. On the other hand, spinners specializing in fine thread generally enjoyed a relatively better income from their profession. Their dedication and attachment to

the spinning wheel were often expressed through popular sayings, such as "Charka amar swami put, charka amarnati, charkardaulateamarduarebandhahati" (The spinning wheel is as dear to me as my husband, son, or grandson. It is due to the spinning wheel that I have an elephant in chains at my door).

The advent of the Industrial Revolution in England led the East India Company to divert its focus from Bengal's manufactured cotton piece goods to the production of raw cotton. The enactment of the Charter Act of 1813 facilitated the entry of English private manufacturers into the Indian market. Consequently, the introduction of British-manufactured cotton goods disrupted the rural environment in Bengal. The British policy at the time was summarized as "leave off weaving, supply us with the raw materials, and we will weave for you."

In 1820, the Agricultural and Horticultural Society was established in Kolkata following the suggestion of Dr. Carey. The primary objective of this society was to enhance agricultural practices in Bengal, with a specific emphasis on improving cotton cultivation. To encourage the cultivation of long staple cotton in Bengal, the Court of Directors provided seeds of American cotton, which were made available to the Agricultural Society. These plants proved to be more productive in terms of cotton yield compared to the varieties commonly cultivated in the region.

The establishment of the Agricultural and Horticultural Society and the promotion of improved cotton cultivation in Bengal were strategic measures taken in response to the changing dynamics of the cotton industry and the growing demand for raw materials in the context of expanding global trade.

During the early years of the nineteenth century, the British cotton textile industry experienced remarkable growth and success. In light of this development, the East India Company embarked on a quest to explore methods of replacing Indian manufactures with British goods, as well as promoting British industries at the expense of Indian industries. The Company's Court of Directors communicated with the Governor of Bombay regarding the

introduction of cotton ginning machines, as part of their broader objective to secure raw materials from India for British industries and stimulate the consumption of British manufactures within India. This two-fold agenda formed a central aspect of England's early commercial policy.

Even with the ascension of Queen Victoria to the throne in 1837, there was no relaxation of the policies previously pursued. Instead, the Parliament focused on inquiries related to how cotton could be grown in India to meet the demands of British looms, rather than exploring ways to enhance Indian looms. The Parliament's aim was to establish an independent English economy that relied on supplies from its own dominions, thus prompting investigations into whether India could provide the necessary raw materials in sufficient quantities.

These actions were motivated by the desire to reduce dependence on foreign nations and foster self-sufficiency within the British economy. Consequently, the focus shifted towards obtaining supplies from India, one of Britain's colonies, rather than improving the capabilities of Indian industries.

Over time, the appeal of Bengal cotton goods in foreign markets significantly diminished, with this decline becoming more pronounced after 1813. The emergence of machine-made, inexpensive British cotton goods flooded the market, leading to a decrease in domestic demand as well. While it is acknowledged that the English played a pioneering role in this process, according to K. K. Dutta, the decline of Bengal cotton goods was a gradual and protracted process that did not have a definitive starting or ending point. Nonetheless, the consequences of this decline were striking, as it disrupted the structure of Bengal's rural society, with women being particularly affected. The importation of British cotton goods not only impacted weavers but also affected spinners, carders, ginners, and others involved in the production process. As the demand for Bengal cloth dwindled, the allure of country thread also waned for weavers and traders.

Great Britain began sending their twisted cotton, valued at

Rs. 81,000, to Calcutta in 1825-26, and this figure eventually exceeded Rs. 8,00,000. By 1838-39, the total value of imported articles reached Rs. 56 lakh. The immediate consequence of this influx was the unemployment of spinners, as home-spun thread simply could not withstand the competition posed by cheaper machine-made alternatives.

Bengal's hand-made piece goods undoubtedly possessed superior qualities in terms of durability, fineness, and texture. However, as is often the case, consumers prioritized cheapness above all else. Consequently, the traditional practice of spinning, symbolized by the housewife's spindle twirling on the cotton-floor, saw a significant decline. The majority of rural women, who had previously been self-sufficient through their earnings from spinning, were now left in a state of helplessness due to the discontinuation of the East India Company's business and the influx of thread exports from England. These women lacked training in alternative vocations and struggled to find employment opportunities, both in mechanical and agricultural sectors. Employment prospects were particularly poor in both rural and urban areas, leading to a decline in the urban population. Cities such as Dhaka, Murshidabad, and Shantipur witnessed depopulation during the early nineteenth century.

The textile companies gradually reduced their investments in Dhaka, with the capital invested in cloth production dropping from Rs. 25 lakh in 1790 to approximately Rs. 3 lakh in 1801. By 1807, it had reached Rs. 6 lakh, and in 1813, it plummeted to Rs. 2 lakh. Consequently, within a span of fifteen years, the East India Company ceased all investments in muslin production.

The repercussions of unemployment among rural women extended beyond mere financial deprivation; the loss extended to Bengal's art and heritage as well. The demise of the handloom industry resulted in a significant loss for India, both in terms of artistic excellence and the artisans' loss of employment. The skill and craftsmanship displayed by women in their artistry surpassed what technology alone could ever achieve. Mill-made cloth never

completely replaced India's indigenous handloom industry, as the intricate designs, qualities, and textures produced by handloom weavers remained unparalleled, except at great expense. These qualities were considered the hallmark of the weavers' skill. However, the women's contribution, particularly in the preparation of the finest yarns, where the fineness was a matter of degree rather than kind, often went unappreciated.

The notion that women's tools are generally inferior may stem from the historically undervalued nature of women's domestic work. Due to the lack of recognition and appreciation for such work, neither families nor societies have dedicated resources toward the technological advancement of tools associated with women's tasks, such as the chula (stove) or broom. As an illustration, in the traditional silk yarn industry, women used rudimentary bamboo reels. They manually pulled out the yarn, twisted it on their thighs, and then wound it onto the reel. This resulted in uneven and brittle yarn that was unable to compete with the filature machine-produced yarn introduced by Europeans in Bengal during the latter half of the eighteenth century.

In the textile industry, the advent of improved mechanized European technologies further marginalized rural women, displacing them from their traditional occupations. Reluctant to invest their physical capital or undergo training for new forms of work, these women found themselves gradually pushed out of the industry. The dominance of mechanized European industry posed challenges for rural women who lacked the resources and willingness to adapt to these new methods.

In summary, women played a crucial role in meeting the societal and familial demands through their utilization of traditional tools. It is noteworthy that women made a significant contribution to the splendor of Bengal textiles, as the quality of the textiles relied heavily on the excellence of both the weaving and the thread, which were spun by the women in rural Bengal. Despite their incredible knowledge and expertise demonstrated in the textile industry, their contributions were seldom acknowledged due to

the absence of institutional recognition. Within their own society, they were often regarded as illiterate individuals of low social status, while in reality, their position and contributions far surpassed those of upper-caste housewives who engaged in leisurely domestic activities and idle conversations with neighbors revolving around ornaments, saris, and local gossip. Unfortunately, history failed to recognize the immense contributions of these spinners, as the male-dominated society overlooked the vital role played by women in the advancement of the esteemed art of Bengal textiles.

Bibliography

F Buchanan, An account of the districts of Bihar & Patna in 1811-1812, p-647

Nirmala Banerjee, Women's Work and Discrimination, in Devaki Jain (ed.) Tyranny of the Household, p-154

H R Ghosal, Economic Transition in the Bengal Presidency, p-2

F Buchanan, An account of the districts of Bihar & Patna in 1811-1812, p-647

D V Mitra, The Cotton Weavers of Bengal, p-163

Ibid, p-174

Ibid, p-153

H R Ghosal, Economic Transition in The Bengal Presidency, p-2

D V Mitra, The Cotton Weavers of Bengal, p-175

Ibid, p-176

H R Ghosal, Economic Transition in The Bengal Presidency, p-2

Ibid

H Hossain, The Company Weavers of Bengal, p-47

Ibid, p-38

N K Sinha, History of Bengal, p-18

J C K Peterson, Bengal District Gazetteers, Dist. – Burdwan 1910, p-122

Martin, History Topography Antiquities & c of Eastern India, Dist. Dinajpur, p-960

Nirmala Banerjee, Women's Work and Discrimination, in Devaki Jain (ed.) Tyranny of the Household, p-156

H Hossain, The Company Weavers of Bengal, p-38

Buchanan, An Account of the Districts of Bihar and Patna in 1811-12, p-647

Buchanan, Shahabad Report, pp-408–9

Shahabad Report, Appendix I

Buchanan, Bihar & Patna, p-647

H R Ghosal, Economic Transition in The Bengal Presidency, p-2

H Hossain, The Company Weavers of Bengal, p-39

H R Ghosal, Economic Transition in The Bengal Presidency, Notes & References, p-13

Amalesh Tripathi, Some Reflections on the East India Company's Charter of 1813, Book: Essays in Modern Indian Economic History, p -194

H R Ghosal, Economic Transaction in the Bengal Presidency, p-244

Ibid, Note & Reference, p-252

Ramesh Dutt, The Economic History of India, vol-1, p-177

Ramesh Dutt, The Economic History of India, vol-1, Introduction, p-xii

Ibid, vol-2, Preface, p- vii

Ibid, vol-2, p-89

K K Dutta, Studies in the History of the Bengal Subah, p-436

H R Ghosal, Economic Transaction in the Bengal Presidency, p-32

Ibid

D V Mitra, The Cotton Weavers of Bengal, p-197

Ibid, p -198

Ibid, p-199

Ibid

S Bhattacharya, Eastern India, The Cambridge Economic History Of India, p-279

D V Mitra, The Cotton Weavers of Bengal, p- 198

Nirmala Banerjee, Women's Work and Discrimination, in Devaki Jain (ed.) Tyranny of the Household, p-157

Nirmala Banerjee (ed.), Changing Industrial Scenario, p-20

Nirmala Banerjee, Women's Work and Discrimination, in Devaki Jain (ed.) Tyranny of the Household, p-155

"Euthanasia: Some Analytical Views"

Dr. Suchismita Ghosh Hazra

Euthanasia is defined as a physician's deliberate act to cause a patient's death by directly administering a lethal dose of medication or other agents. Euthanasia has been called "Mercy Killing" also. When the sufferings of the patient pose unbearable problem to the patient particularly, the question of ending his or her life with the help of a doctor comes. It is directly opposed to the basic task of a doctor. Because,a physician is responsible for curing the sufferer, to heal, to alleviate pain and to prolong life. The idea of euthanasia is likely to put a physician in a state of confusion and conflict of conscience. To take part actively in the actual performance of euthanasia is difficult to bear psychologically. The role of a healer is transformed into the role of a killer, though with consent and legal approval creates a sense of defeat from the standpoint of medical ethics. In the Hippocratic Oath a physician is debarred from prescribing a deadly drug or giving advice which may cause death of the patient. It must be remembered that the whole spirit of medical education comes from the basic idea of Hippocratic Oath. So, a doctor is supposed to follow the moral standpoint of the medical education system. Euthanasia has been rejected by doctors since the fifth century B.C as it contradicts the oath of Hippocrates. The original oath is full of code of conduct meant for medicos. It states in one place "I will neither give a deadly drug to anybody if asked for it, nor will I make a suggestion to this effect."[1]

Quality of life is the most important thing regarding euthanasia. All of we know that we have a right over the body. We have a right to live with dignity and we should have a right to leave this world with dignity. If a person does not have minimum pleasure in his life then life will become meaningless to him. There are many examples from our daily life where biological life continues but human life in any meaningful sense has ceased. In one case, the

patient is an irreversible coma reduced to a vegetative existence. In still another case, the patient's personality has completely deteriorated. In each of these cases, the quality of life has deteriorated. There is no longer any capacity for creative employment, intellectual pursuit or the cultivation of interpersonal relationships. In short, in each of these cases life seems to have been rendering meaningless in the sense that the individual has lost all capacity for normal human satisfactions. In such position, euthanasia can be considered as desirable.

There are two types of distinction that are prominent in the discussions of euthanasia. The first distinction is between active and passive euthanasia and the second distinction is between voluntary and involuntary euthanasia.

Active euthanasia means taking a direct action to kill the terminally ill patient, giving him a lethal injection prescribed by the doctor. On the other hand, passive euthanasia means allowing the terminally ill patient to die by withholding treatment or by withdrawing life saving devices.

Voluntary euthanasia means mercy killing of a terminally ill patient with his or her consent. On the other hand, involuntary euthanasia means mercy killing without the consent of a terminally ill patient because the person is incapable of giving his or her consent. But in this case, the consent of the patient's family members or relatives can be obtained.

To clarify, it can be said that a patient suffering from very painful and terminally ill cancer may ask to be killed with a fatal injection or morphine to relieve himself or herself from acute pain and suffering is an example of voluntary euthanasia. On the other hand, the possibility of involuntary euthanasia arises in cases of comatose adults or in cases of severely defective newborns.

It is noticeable that combination of voluntary and involuntary distinction with the active and passive distinction results in four types of euthanasia.2 They are namely – i) Active voluntary euthanasia ii) passive voluntary euthanasia

(iii) Active involuntary euthanasia and

iv) Passive involuntary euthanasia.

There are some arguments in support of euthanasia. For example, the quality of one's life is as important as the length of one's life. Terminally ill patients should be provided with an easier, better and dignified death without suffering. Moreover, Euthanasia is in the best interest of the hospital staff and other patients. Because, the hospital staff can pay more attention to other patients and also use the medical resources for other patients who would be benefited from them.

Similarly, there are also some arguments against the euthanasia. For example, euthanasia results in disrespect for the sanctity of human life. Since death is irreversible, the wrong diagnosis of a disease by a physician needlessly kills the patient. Moreover, euthanasia violates the natural inclination of human beings to prolong their life until they go through a natural death and thus, euthanasia goes against nature. Because, God has supreme dominionover all things in the world, including human life. Therefore, no person should destroy his life or the life of another person. The patient should not be allowed to die before a natural death comes to him, because research in medical science might discover a cure for the ailment that is causing severe pain to the patient. Euthanasia, a new definition of death, is already accepted in some western countries like Canada, Netherland, Britain. There are different legal standpoints on euthanasia in different countries of the world. For instance, Netherlands is in the top position about the euthanasia. In Netherlands, euthanasia is legal and regulated by termination of life on "request and assisted suicide". Doctors in the Netherlands who comply with certain guidelines can now openly carry out euthanasia and can report this on the death certificate without fear of prosecution. In November 30, 1994, the Netherland parliament finally put into law the guide lines under which the Dutch doctors are permitted to give lethal injections to patients who are suffering unbearably without hope of improvement. On 4th February 1993, Britain's highest court ruled that doctors could lawfully act to end the life of their patients.

Belgium legalized euthanasia in September 2002. In the U.S.A, although euthanasia is illegal in all states, physician assisted dying is legal in Washington and Montana. In traditional Eskimo societies it was the custom for a man to kill his elderly parents, but the murder of a normal healthy adult was almost heard of. 3

Recently, India has become conscious about the euthanasia. There was a recent verdict of supreme court delivered on 7th March, 2011 by a bench comprising Justices MarkendeyKatju and GyanSudha Mishra.4 It is a path breakingjudgment which tends to legalize what is commonly referred as "Passive Euthanasia".

This famous verdict was the result of a petition filed for grant of such permission by writer cum social activist Pinky Virani on behalf of ArunaRamachandraShanbaug, a hapless comatosevictim of sexual assault who had been in persistent vegetative state (PVS) for the post over thirty seven years at Mumbai's reputed KEM hospital. Although the supreme court declined such request in respect of Aruna, it permitted passive euthanasia in appropriate cases albeit with stringent guidelines. But there is no law in India as its guideline. Aruna's case was covered in the non-voluntary euthanasia.Because, in this case the consent was not taken directly from Aruna, but from Pinky Virani.

Here, any type of euthanasia, has not been supported in the perspective of most of the Indian philosophy,especially on the basis of Buddhist and Samkhya Philosophy. Indian Philosophy apparently seems pessimistic about the life, but actually it is optimistic. Because, the different paths of "cessation of sufferings"(liberation) in Indian philosophy never support the annihilation of physical existence (death) of a man. For example, Buddhism and Samkhya system admit sufferings (sorrows) as an inevitable fact of human life. But, these are not pessimistic philosophy. Because,Buddhism admitted "cessation of sufferings"(nirvana)in human life by the realization of four noble truths and Samkhya admitted "cessationof sufferings" by the realization of the difference between non-consciousness(prakrti)and consciousness(purusa).

Lord Buddha's ethical teachings is dependent on the sufferings

of human being. The message of his enlightenment points to man the way of life that leads beyond sufferings.5These have come to be known as the four noble truths (catvariaryasatyani). They are namely-

i) Life in the world is full of sufferings

ii) There is a cause of these sufferings

iii) It is possible to stop sufferings

iv) There is eightfold noble path (astangikamarga) to stop these sufferings.

That is to say, in Buddhism there is a path which leads to the cessation of sufferings(duhkha,duhkhasamudaya, duhkhanirodha, duhkhanirodhamarga). All the teachings of the land Buddha center round these four.

Similarly, Samkhya system also admits three types of sorrow-in human life. Samkhyakarika, the most authentic text of samkhya, begins its analysis about the sufferings of different beings. It states that a desire for alleviation of three kinds of sorrow arises in the mind of the sufferer. adhyatmika,adhibhautika and adhidaivikaare the three types of sorrow (duhkha), which destroy the pleasures of life.6 Among these, adhyatmikaduhkha is produced by the disorders of either mental or physical system of the individual concerned. There are two types of adhyatmikaduhkha, such as sariraduhkha (physical sorrow) and manasaduhkha (mental sorrow). The transformation (parinama) of gross body (sthulasarira) which occurs by the disbalanced state of vayu, pitta and kaphaof sthulasarira is called sariraduhkha (Physical sorrow) and the transformation of subtle body (suksmasarira) which occurs by the influence of kama (desire), krodha (anger) etc is called manasaduhkha (mental sorrow).

Samkhya admitted two types of liberation, i.ejivanmukti(-embodied liberation) and videhamukti (disembodied liberation). Disembodied liberation means annihilation of gross body. But in the state of embodied liberation both subtle body and gross body exist. Samkhya considers, even after the attainment of embodied liberation a man must enjoy his fruit of action (prarabdhakar-

maphalbhoga) and this enjoyement may be in the form of sufferings till his disembodied liberation.

So, it can be said that both Buddhism and Samkhya system admits that physical existence is the cause of sufferings. But, without the body ultimate cessation of sufferings (liberation) is impossible. So, "euthanasia" which leads to the prior death for escapement from sufferings is inconsistent with the path of liberation both in Buddhism and samkhya system in Indian philosophy.

Bibliography

1) Ethical Quandaries in Human Genetics"-
Jyotish Chandra Basak, published by Levant Books, Kolkata 700014, 1stEdition 2008, P-26.
2) "Ethics: Theory and Practice" – Y.V. Satyanarayana, published by Dorling kindersley (India) Pvt. Ltd, 1st edition, 2010, P-165.
3) "Practical Ethics"- Peter Singer, published by Cambridge university press, 1st Indian Edition, 2000, P-217.
4) "Lawyers update" (journals) – volume XVII, Part – 4 , published by universal Book Traders, Delhi – 110054, April 2011, P-12.
5) "BharatiyaDarsana" (1st Part) – PramodbandhuSengupta, Banerjee publishers, Calcutta 700009, 12th edition, March, 1986, P-122.
6) Samkhyakarika – I, VedantacuncuPurnachandra (edn.and Trans), samkhyakarika, 1stedn., West Bengal state Book Board, August, 1983.

বিশ্বপরিবেশ সংরক্ষণ ও সুস্থ সমাজ সংগঠনে জৈনধর্মের অবদান

সুস্মিতা ঘোষ

আধুনিক ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রধান ও প্রথম সমস্যা পরিবেশ দূষণ তথা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপুল ব্যবহারে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পশ্চিমী ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব পরিবেশ দূষিত বিপন্ন। 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' (Global warming) এখন একটি অতি পরিচিত শব্দ তথা বিষয়। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর জীবন ধারায় যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারে কল- কারখানা, যান-বাহনের নির্গত ধোঁয়া,প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার সব দিক থেকেই প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত নষ্ট করছে। সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ভোগবাদী সমাজের প্রধান অসুখ। নগরায়ন হেতু অবিবেচিত বৃক্ষচ্ছেদন, অবাধ যৌনতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের পন্যায়ণ ও মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নির্গমনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ বিপন্ন। যার ফল স্বরূপ উষ্ণায়ন, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি, অম্লবৃষ্টি, ওজনস্তরে চ্ছেদ ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় বন্যা,খরা, মহামারী, ভূমিকম্প,সুনামী প্রভৃতির ফলে বিশ্বে জীবকূল আজ বিপন্ন, জীববৈচিত্র নষ্ট, আর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিপর্যস্ত।

এই পৃথিবী মাতৃরূপা, তার অসংখ্য জীবকূলকে অজীব সত্তাকে আপন সন্তানের মত লালন সংরক্ষণ করছে। প্রকৃতির এই দান নিঃস্বার্থ; অকৃপণ উদার। আর এই সকল জীবনের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে স্বার্থলোলুপ, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং মনুষ্যকেন্দ্রিক জীবনে ব্যাস্ত অভ্যস্ত। অন্য জীবনের প্রতি তার দৃষ্টি শুধু ভোগের, সংরক্ষণের নয়। তাই আজ বহু প্রজাতির প্রাণী অবলুপ্ত, অদৃশ্য পৃথিবী থেকে চিরতরে। আর যে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সম্পদ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, খাদ্যবস্ত্র পানীয় বায়ু যোগায় তারই চরমতম ক্ষতিসাধনে মানুষ ব্যাপৃত, ব্যাস্ত। এই চরম ব্যাধি থেকে পৃথিবী, প্রকৃতি সহ সমস্ত জীবকূল (মানুষ সহ) কে রক্ষার একমাত্র উপায় প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ প্রকৃতি সংরক্ষণের নীতি শিক্ষার মধ্য দিয়েই সম্ভব। পরিবেশের তথা মনুষ্যসৃষ্ট জীবকুলের এই চরম সংকট থেকে মুক্তির উপায় হল প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাচার্যদের প্রদর্শিত পথ পরিবেশ সচেতন শিক্ষা। যেখানে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের প্রকৃত এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায় নির্দেশ রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ—

বেদ,উপনিষদ,পুরাণসমূহ, সূত্রগ্রন্থ, রামায়ণ,মহাভারত,শ্রীমদ্ভগবদগীতা, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে প্রকৃতি, জীব ও জড় বা অজীব সত্তার বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের শান্তিজনক সহবাসের পথ নির্দেশ রয়েছে। "Our mad race for economic development through industrialization at the cost of environment would ultimately lead to disaster. If the present rate of pollution is not checked the man will see, eat and breath pollution, so, the solution lies en harmonizing of economic development with environment".[1]

মানুষ সহ সমগ্র জীবের অস্তিত্ব নির্ভর করছে প্রকৃতির সঠিক সংরক্ষণ, সম্পদের পরিমিত ব্যবহার এবং সমগ্র জীবসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে তার বিকাশে সহযোগীতা করা। প্রকৃতির সংকট, সমস্ত জীবের সংকট, জৈন ধর্মে এই প্রকৃতি সংরক্ষণ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রয়েছে যা আজকের বিশ্বজোড়া সংকট নিরসনে একমাত্র উপায় হতে পারে।

বেদ উপনিষদের পরম্পরা থেকেই বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ধারা সৃষ্ট, তবে তা ভিন্ন রূপে উপলব্ধ। জৈন মতে "বিশ্বজগত চলেছে জীব ও অজীবের পারস্পরিক সম্বন্ধে ফলে, অজীব বলতে বোঝায় পাঁচটি শ্রেণীভুক্ত সত্তাকে—আকাশ (শূন্য), ধর্ম (যা চলমান), অধর্ম (যা নিশ্চল), কাল (সময়) ও পুদ্গল (বস্তু)। আত্মা যে শুধু মানুষ, জন্তু, বৃক্ষ ও উদ্ভিদের আছে তা নয়। আত্মা আছে পাথরের, পাহাড়ে, বহতা নদীর, আরও অন্যান্য বস্তু"।[2]আত্মা শুধুমাত্র জীবেরই নয়, জৈনদের বিশ্বাস অজীব বা জড়বস্তুর ও আত্মা রয়েছে, জীব ও অজীব পরস্পরের আত্মা কর্মের সূত্রে আবদ্ধ। তাই জৈন ধর্মের মূল নীতি হল আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে প্রাপ্তির চক্র থেকে মুক্তি লাভ, যা কেবল সীমিত কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়েই সম্ভব। কর্মের সম্পূর্ণ বিলয় ঘটলে তখনই আত্মা জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে। আর কর্মের বিলয় সম্ভব কেবলমাত্র আত্মসংযম, সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের মাধ্যমে। জৈন তীর্থঙ্করগণ আত্মার মুক্তির উপায় স্বরূপ কতকগুলি দশর্নের উল্লেখ করেছেন। পঞ্চমহাব্রত (Five vows),তত্ব (Fundamental principles), দ্রব্য (Dravya 0r substances), অনেকান্তবাদ,(Anekantavada) পরম্পরোপগ্রহ জীবনম (equanimity), জীব দয়া (kindness to animals) নিরামীষ আহার, আত্ম সংযোম, অপচয় না করার ও অহিংসার মধ্য দিয়ে আত্মার কর্ম নিবৃত্তি এবং কর্মের নিবৃত্তির মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তি সম্ভব।

আধুনিক ভোগবাদী ও পুঁজিবাদী বিশ্বের মূল সমস্যাই হল অনিয়ন্ত্রীত

ভোগ এবং অসংযোমী জীবনযাপন, এই ব্যাধি হতে উদ্ধারের উপায় হিসেবে জৈন দর্শনের নীতিই যথেষ্ট—১) অহিংসা, ২) অপরিগ্রহ, ৩) অনেকান্তবাদ ৪) ব্রহ্মচর্য ৫) সত্যবাদিতা। যদি জৈন ধর্মের এই নীতিকে কঠোরভাবে পালন হয় তবে প্রকৃতির যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা সংশোধন সম্ভব।

১) অহিংসা (Non injury or non violence)—জৈন ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রত হল অহিংসা। অহিংসাই মূল ধর্ম। "Nothing is higher than Mount Meru or anything more expansive than the sky. Likewise know that Dharma is canal to Ahimsa in the world".[3] অন্যান্য ধর্মেও অহিংসা নীতি পালিত হয়, তবে জৈন ধর্ম স্বতন্ত্র তার এই অহিংস দশর্নের কারণে। জৈন সূত্র অনুযায়ী "The severance of vitalities out of passion is injury"[4] [Tattavarthsutra] সুতরাং জৈন গ্রন্থের বক্তব্য অনুযায়ী অহিংসা হল ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থে কোন জীবের জৈবিক সত্তার হানি সাধনই অহিংসা। তা সে শারিরীক, মানসিক কিংবা বাচনিক ব্যবহার করলেও হিংসা প্রদর্শিত হয়। আধুনিক ভোগবাদী বিশ্বে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত ভোগে প্রতিনিয়ত প্রচুর পশু হত্যা করা হয়; খাদ্যের তথা অনান্য প্রয়োজনে; জৈন মতে এই হিংসার কারণেই সমগ্র বিশ্ব আজ কষাইখানাতে পরিণত হয়েছে। সচেতন কিংবা অচেতন ভাবে মানুষ জীব হত্যা করে, এর থেকে সতত বিরত থাকাই অহিংসা। মানুষের মত করে অন্য জীবেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, অন্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্য জীবের আত্মার অস্তিত্বের উপলব্ধিই পারে এই পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রগত ভারসাম্যহীনতাকে সঠিক পথে আনতে। শ্রদ্ধা ভিন্ন সমগ্র বিশ্বের বিশ্বভাতৃত্ব, এবং শান্তিজনক সহাবস্থান অসম্ভব। আজকের আধুনিক বিশ্বে মারণাস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিযোগীতায় অহিংসাই একমাত্র পথ—জৈন গ্রন্থ 'আকারঙ্গসূত্রানুযায়ী'—"every human being wants to live; nobody likes suffering. Therefore do not inflict suffering on anybody. This is non-violence"[5] জৈন সূত্রে অপরের ক্ষতি সাধনই হিংসা; আর এই কর্মই সেই জীবাত্মার মুক্তির অন্তরায়। কর্ম জ্ঞানমূলক চেতনার দ্বারা সম্পাদিত হলেই তা অহিংস হবে। অর্থাৎ এমন পরিস্থিতর উপস্থিত যেখানে আত্মবিপন্ন, সেক্ষেত্রেই অপরের প্রতি হিংসা প্রদর্শনের যৌক্তিক প্রয়োজন স্বীকার্য, অন্যথায় তা হিংসা, অশ্রদ্ধা রূপে বিবেচ্য। "all of us have two fold consciousness knowledge consciousness (জ্ঞানচেতনা) and action consciousness (karmachetana)[6] সুতরাং যে কর্ম

জ্ঞান চেতনার দ্বারা সম্পাদিত, তা শুদ্ধ পবিত্র এবং অহিংস; এর দ্বারা কোন জীবের ক্ষতিসাধন হয় না, বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণে এই জ্ঞান চেতনারই প্রয়োজন এখন বেশী। লোভ, অপরিনামদর্শী ভোগের ফলে প্রতিনিয়ত, প্রকৃতির ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। জৈন ধর্মের অহিংসাই বাঁচার একমাত্র পথ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু থেকে উৎকৃষ্ট জীব মানুষের মধ্যে সেই পরম চৈতন্যের স্বপ্রকাশ উপস্থিতি; তাই সর্ব জীবের প্রতি করুণা, শ্রদ্ধা ও অহিংস প্রদর্শনই হল মুক্তির পথ। আর সর্ব জীবের প্রতি শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে জীবের সংরক্ষণ সম্ভব—যা বিশ্বপ্রকৃতি পরিবেশকে সুরক্ষিত করবে। সজীব নির্জীব, সচল নিশ্চল, সকল প্রকার জীবের প্রতি কায়—মন—বাক্যে হিংসা থেকে বিরত থাকাই অহিংসা। তাই জৈন সন্ন্যাসী গৃহী সকলের কাছেই মাংস আহার নিষিদ্ধ। এমনকি কীট পতঙ্গের জীবনও সর্তকভাবে রক্ষা করা কর্তব্য।

ব্যহারিক জীবনেও জৈন সন্ন্যাসীরা জল ছেকে খেতেন, যাতে জল অন্তর্গত জীবাণু রক্ষা পায়, আবার পথ চলার সময় পালকের সম্মার্জনা দিয়ে পিপড়ে কীট পতঙ্গাদী ক্ষুদ্র প্রাণীদের ঝাট দিয়ে সরিয়ে দেওয়া যাতে অনিচ্ছাকৃত হানি না ঘটে। জৈনরা মুখে বস্ত্রের আবরণ ব্যবহার করে যাতে আনুবিক্ষণীক জীব শ্বাসের সঙ্গে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে মারা না যায়। চাষের কাজে জীবন নষ্ট হয়, তাই জৈন সন্ন্যাসীদের কৃষিকাজ নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি আগুনের ব্যবহারও সীমিত ছিল কারণ আগুনে পতঙ্গাদী পুড়বে, এবং অগুনের সহযোগী বাতাসের সূক্ষ্ম জীব পুড়বে এইরূপ চরম অহিংসের দর্শন জৈন ধর্মকে স্বাতন্ত্র দান করেছে।[৭] আর পরিবেশ রক্ষায়, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা এই রূপ ভাবনা আজকের হিংসাদীর্ন বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে। জৈন নীতিতত্ত্বে অহিংসার চারটি ভিন্নতর সম্পর্ক রয়েছে —১) মৈত্রী—বন্ধুত্ব (friendliness) ২) প্রমোদ—দর্শনেই আনন্দ (feeling glad at the sight of virtuous) ৩) করুণা (compassion for those who are in misery) ৪) মধ্যস্থ (Equanimity to those who are without virtue)[৪] অহিংসা জীবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ আদর্শ। জীবের দুঃখের মূল কারণই হল কর্ম এবং কর্মে হিংসা যুক্ত। "কর্মনা শরীর" কর্মের মধ্য দিয়েই হিংসা সম্পাদিত হয়। মহাবীর দুই ধরনের হিংসার উল্লেখ করেছেন—'অর্থ হিংসা এবং অনর্থ হিংসা'। আপন অস্তিত্বের প্রয়োজনে সম্পাদিত হিংসা হল অর্থ হিংসা, কিন্তু অপ্রয়োজনে সম্পাদীত হিংসাই অনর্থ হিংসা, যা সর্বদাই পরিত্যাজ্য।

অপরিগ্রহঃ—(Non-attachment,non-possession)—জৈন ধর্মেও দর্শনের মূল ভিত্তি হল অহিংসা ও আত্মসংযোম। এই দুটি জীবার্দশ

ভিন্ন জীবের বস্তুগত মোহময় জীবন—মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি নেই। জৈন ধর্ম সব সত্তাকেই সংবেদী চেতনাযুক্ত এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মনে করে। আর উচ্চতর জীব কেবলমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই অজীব সত্তাকে ব্যবহার করবে, সংযম তথা আত্মনিয়ন্ত্রনই সেখানে মূল উপজিব্য বিষয়। 'অপরিগ্রহ' ব্রতের তাই মূল নীতিই হল—সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা স্বার্থশূন্যভাবে বিষয়াসক্তি,মোহ লোভ থেকে মুক্তি। জৈন দর্শনে জীবের ভোগই তার দূর্ভোগের দুঃখের মূলকারণ, তাই পরিমিত ভোগ, দ্রব্যের ব্যবহারে সংযম অত্যাবশ্যক। জৈন গ্রন্থ দশবৈকালিকা সূত্রানুযায়ী "As the bee that stucks honey in the blossoms of a tree without hurting the blossom and strengthening itself, the monks take food from lay people such they do not disturb them"[৯], অর্থাৎ জৈন দর্শনে কোন বস্তুর কোন রুপ ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন না করে আপন নিয়ন্ত্রিত প্রয়োজন সাধনই অপরিগ্রহ। অধিক ভোগ, অনিয়ন্ত্রিত লোভের বশে আজকে বিশ্ব নিমজ্জীত। জৈন দর্শনে এই ভোগই মুক্তির অন্তরায়। পুদগল বা জড়বস্তু সমূহ অনন্ত অবয়ব বিশিষ্ট। মিথ্যা দর্শন, অবিরিত, (আসক্তি), প্রমাদ (অসতর্কতা), কষায় (মান, মোহ প্রভৃতি) এবং যোগের (আস্রব) নিমিত্ত জীব পুদগল সমূহকে গ্রহণ করে তাদের সাথে যুক্ত হয়, এটিই জীবের বন্ধন। তত্ত্বসূত্রে বলা হয়েছে—"সকষায়ত্বাৎ জীবঃ কর্মভাবযোগ্যপুদ্গলানাদত্তে স বন্ধ"। কষায়ই জীবের সকল বন্ধনের মূল হেতু।[১০] জৈন দর্শনে দুঃখ দুর্দশাভোগী আত্মাকে 'জীব' বলা হয়েছে। আর এই জীব পুদগল আশ্রয়ে আপন মুক্তি বিস্মৃত হয়। ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ ইত্যাদি কাষায় এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীব আত্মা কর্মপুদগলে অনুপ্রবেশ, আকৃষ্ট বা মোহগ্রস্ত হয়। এই মোহ মুক্তিই জৈন দর্শনে 'অপরিগ্রহ'। জৈন মহাবীরের মতে বন্ধ দ্বিবিধ ভাববন্ধ ও দ্রব্যবন্ধ। এই দুই বন্ধ মুক্তির উপায় হল পুদগল আস্রব বা সঞ্চার বন্ধ করে 'সংবর' এবং 'নির্জর' এর মধ্য দিয়ে কর্ম নাশ। জীবের কামনা-বাসনার জন্যই পুদগল আস্রব বা সংযোগ ঘটে। পরিগ্রহ হল মহাকর্মের হেতু; যা আত্মমুক্তির অন্তরায়। পার্থিব বস্তুর আর্কষণে মোহে তার প্রতি আসক্তি এবং অধিকারই পরিগ্রহ, ভূমি সম্পত্তি, বাড়ি, অর্থ,অলংকার, স্বর্ণ ঝি চাকর, রত্নাদী কিংবা বিলাসবহুল ভোগের সামগ্রি সবই। এর থেকে নিবৃত্তিই অপরিগ্রহ।[১১]

জৈন ধর্মের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আসক্তি থেকে প্রতিনিবৃত্তি হওয়াকেই অপরিগ্রহ বলা হয়েছে। রুপ, রস, গন্ধ ও শব্দ যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করাই অপরিগ্রহ। জৈন মতে বিষয় বাসনাই দেহধারণের কারণ, তাই

বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত না হলে জীবের বন্ধন মুক্তি সম্ভব নয়। 'মানুষের সহজ সরল জীবনযাপন। অনাসক্তি, আত্মসংযম, সর্বোপরি অহিংসার পরিশীলন ব্যতিরেকে পরিবেশকে বর্তমান সংকটের করাল গ্রাস থেকে সমুদ্ধার করা সম্ভব নয়। আর পরিবেশ যদি স্থিতিশীল না হয় তবে মনুষ্যকূল তথা সমগ্র জীবকূল ধ্বংস হয়ে যাবে।[12]

জৈন দর্শন জীবনের প্রাত্যহিক ন্যুনতম প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে তবে অধিক গ্রহণকে নিন্দা করে। মানুষ তার লোভের বশবর্তী হয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ভোগে প্রবৃত্ত হয়, জৈন দর্শনে জীবন চর্যায় যা নিন্দানীয়, সর্বথা নিষিদ্ধ। সম্পদের সংগ্রহ, ক্ষমতার প্রতিযোগীতায় আজ সমগ্র বিশ্ব বিপথগামী, মারণাস্ত্রের সম্ভারে দিগভ্রষ্ট, পারমানবিক অস্ত্রের মত সর্ববিধংসী অস্ত্র আজ সমগ্র জীবকুলের অস্তিত্বের প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। জৈন ধর্মের এই 'মহাব্রতের' দর্শনই পারে আজকের ভোগদীর্ণ, সমস্যাজীর্ণ বিশ্বকে রক্ষা করতে। "Jainism in its 'aparigraha' vows, advocates universal ethics for social-excellence and spiritual upliftment. Possessiveness and violence are related. Therefore to practice non-violence one has to give up attachment to possession."[13]

জৈন সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে অপরিগ্রহ কঠোরভাবে পালনের বিধান রয়েছে। কারণ কামনা বাসনা জাত পরিগ্রহই বন্ধন। মুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জৈন ধর্মে তাই কঠোর সংযম তথা চরম কৃচ্ছসাধনের নিদর্শন আছে। সংঘ রক্ষার জন্য সন্ন্যাসীকে সর্বত্যাগী হতে হবে। শুধু জাগতিক বিষয় নয়; নিজের দেহ-মন-প্রবৃত্তিকেও সন্ন্যাসী স্বকীয় মনে করবেন না। কারন অজীব মাত্রই কর্মের বন্ধনে জীবকে আবদ্ধ করে।

অনেকান্তবাদঃ [Non-Absolutism or the Doctrine of Multiple vision]—জৈনরা অনেকান্তবাদী, অর্থাৎ তাঁরা কোন একটি নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত বা সত্যকে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কোন সৎ বস্তু অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট। 'একান্ত' অর্থ 'একপক্ষ' বা 'কোন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত'; আর কোন বস্তু অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট বলেই কোন একটি অবস্থা বা ধর্ম স্থায়ী নয়। দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম আপেক্ষিক সত্য; কারন তা পরিবর্তনশীল এবং অনিত্য। জৈনরা বেদপ্রমান্য স্বীকার করে না।তাদের মতে উপনিষদ বা বৌদ্ধমত সত্যের একটা বিশেষ দিকমাত্র(একান্তভাব) দেখেন, সত্যের নানা দিক (অনেকান্তভাব)। সত্য একদিক থেকে নিত্য আবার অন্যদৃষ্টিতে অনিত্য বা পরিবর্তনশীল। জৈনগণ বলেন, অল্পজ্ঞ লৌকিক জীবের কোন জ্ঞানই পূর্ণ সত্য নয়। আবার সেই জ্ঞান পূর্ণ মিথ্যাও নয়। সকল লৌকিক জ্ঞান আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য। জৈন দর্শনে একে 'স্যাদবাদ' বলে।

'স্যাদ' শব্দটি 'অনেকান্ত' বোধক। জৈনগণ অনেকান্তবাদ বোঝাতে একটি কাহিনীর অবতারণ করেছেন—অন্ধব্যক্তিদের হস্তীর নানা অঙ্গের জ্ঞান ও তার জন্য বিরোধের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন "এক অন্ধব্যক্তি হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করে বলে, 'হস্তীটির আকার গ্রাম্য হাত পাখার মত; অন্য অন্ধব্যক্তি হস্তীর শুঁড় স্পর্শ করে বলে, 'হস্তীটির আকার সর্পের মত', অন্য অন্ধব্যক্তি হস্তীর পা স্পর্শ করে বলে 'হস্তীটি স্তম্ভের মত'। এইভাবে বিভিন্ন অন্ধব্যক্তি হস্তীর বিভিন্ন অঙ্গ জেনে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে হস্তীর আকার সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনিত হয়। প্রত্যেকেরই সিদ্ধান্ত মিথ্যা নয়, আংশিক বা আপেক্ষিক সত্য। কেবল যে ব্যক্তি চক্ষুষ্মান হস্তীকে পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করে তার পক্ষেই সামগ্রীক সত্য ও সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া সম্ভব।[14]

জৈন মতবাদ বস্তুতান্ত্রিক। জৈনদের স্যাদবাদ ও অন্যকান্তবাদ তত্ব পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত; এই মতবাদ অনুসারে সাধারণ লৌকিক জ্ঞান (অপূর্ণ মানুষের) কেবলমাত্র বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতেই সত্য; চরম সত্য নয়। কোন একটি যখন পূর্ণ সত্য দাবি করে তখনই কলহ, বিবাদ ও অযৌক্তিক গোড়াঁমি সৃষ্ট হয়। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ মতবাদকে যাঁরা চরম সত্য মনে করে তারা একান্তবাদী। জৈনদের মতে বিভিন্ন মতবাদই একসঙ্গে সত্য হতে পারে, তাই তা অনেকান্তবাদী।[15] সুতরাং জৈন মতবাদ উদার এবং পরমত সহিষ্ণু। কোন একক সিদ্ধান্ত বা মতকে তারা চরম বা একমাত্র সত্য বলে স্বীকার না করে বহুত্বের ভাবনাকে মান্যতা দেয়। আজকে ধর্মান্ধ বিশ্বে এই মতই একমাত্র সমাধান, শান্তি আনতে পারে। আধুনিক ভোগবাদী তথা একান্তবাদী বিশ্বে যেখানে ধর্মে ধর্মে হানাহানি, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ গোটা বিশ্বকে সন্ত্রস্ত অশান্ত করে তুলেছে, সেখানে একমাত্র অনেকান্তবাদী দর্শন শান্তির বারি বর্ষণে সক্ষম। জৈন আচার্যগণের দৃষ্টিতে শুধু নিজের ধর্ম বা নিজের মত পথ একমাত্র হতে পারে না, বিভিন্ন ধর্ম, মত পথ যে একসাথে সত্য হতে পারে, অনেকান্তবাদী জৈন দর্শন তা প্রমাণ করেছে। "Anekanta is not only a tool for logical development, but it is equally useful in developing the self, family life, society, community, management, therapy, counseling, political decisions, jurisprudence and all other disciplines of human life- it help to develop the tolerance and coexistence of mind and explores new insight to lead a life of peace and harmony".[16]

জৈন অনেকান্তবাদ এর দর্শন শুধু তত্বগত বিষয় নয়; সমাজ

সংসারে অপরকে মান্যদান, শ্রদ্ধা বা সহিষ্ণুতা প্রদর্শনই এই দর্শনের মূল অর্থ। আজকের সমস্যাদীর্ন বিশ্বে অনেকান্তবাদী দর্শনের দ্বারা বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিজনক সহাবস্থান অনেক সহজ হয়। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সৌভাতৃত্ব, মুক্ত উদার চিন্তার দ্বারাই সম্ভব। অহিংস নীতির প্রয়োজনেই অনেকান্তবাদের দর্শনের দরকার। অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধা অসিষ্ণুতা ও সহিংস্রতাই নামান্তর। "It is holistic principle. It is ideal for successfully managing conflicts. The kind of intellectual tolerance it will develop, will further lead to an atmosphere of peaceful co-existence avoiding dogmatism and fanaticism".[17]

উপসংহারঃ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আজকের বিশ্ব ভোগের রোগে আক্রান্ত। মাত্রারিক্ত লোভ সমগ্র বিশ্ব তথা জীবকূলকে করে তুলেছে বিপন্য। অসংযমী জীব মানুষই এর জন্য একমাত্র দায়ী। বিজ্ঞান প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী যে সংকট ঘণীভূত হয়েছে তার নিরসন করতে প্রয়োজন সম্যক দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক চরিত্র। জৈন ধর্মের এই 'ত্রিরত্নের' মধ্যেই নিহিত আছে আজকের বিশ্বের বিপুল সমস্যা একমাত্র সমাধান।" সম্যগ্ দর্শন জ্ঞান চরিত্রাণি মোক্ষ র্মাগঃ"(তত্বার্থবিধম সূত্র উমাস্বামী)। আত্মিক আধ্যাত্মিক মোক্ষ তো বটেই আজ এই ভোগবাদের মনুস্যসৃষ্ট সংকটে জৈনধর্মের মহাব্রত, বিশেষতঃ অহিংসা, অপরিগ্রহ এবং অন্যকান্তবাদী দর্শন হতে পারে একমাত্র বাঁচার উপায়। সম্যক জ্ঞান, দর্শন চরিত্র ভিন্ন এই সুস্থ স্বার্থশূন্য চিন্তা, উদার অহিংস তথা বহুত্ববাদী চিন্তা সম্ভব নয়। দ্বন্দ্ব নয়, বন্ধুত্ব, বিবাদ কলহ নয়, বোঝাপড়ার মধ্যদিয়েই সম্ভব, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, মান্যতা এবং সহিষ্ণুতা আনতে পারে বিশ্ব শান্তি। জৈন দর্শনের মধ্যে আছে সেই সূত্র।

Reference :

1. J.K. Galbraith, 1967, On the nature of our Industrial civilization, New Delhi, Industrial State, P-67
2. Anghshupati Dasgupta, Atiter Ujjal Bharat (ভাষান্তর), The wonder that was India, Progressive Publishers, 2005, P-395
3. J.K. Galbraith, 1967, On the nature of our Industrial civilization, New Delhi, Industrial State, P-79

4. Tattavarthsutra
5. Akaranga Sutra
6. Dayananda Bhargava, 1968, Jain Ethics, Motilal Banerasi Dass,New Delhi, P-33
7. Anghshupati Dasgupta, Atiter Ujjal Bharat (ভাষান্তর), The wonder that was India, Progressive Publishers, 2005, P-67
8. Gita Meheta, 2010,Ecological Insight in Jainism,at Institute of Gandhian Studies, Gouripur, Wardha
9. Gita Meheta, 2010,Ecological Insight in Jainism,at Institute of Gandhian Studies, Gouripur, Wardha
10. দেবব্রত সেন, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৪, পাতা-67-69
11. Asha Mukherjee, Jainism : Its identity on the basis of literature and Philosophy, Religion and Literature Indian perspective, Edited by Projit Kumar Palit, P-199
12. Anubrata Global Organization, Lardnan, 1995, Environmental Conference.
13. Gita Meheta, 2010,Ecological Insight in Jainism,at Institute of Gandhian Studies, Gouripur, Wardha
14. দেবব্রত সেন, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৪, পাতা 40-41
15. নীরদবরণ চক্রবর্তী, ভারতীয় দর্শন, পাতা 63
16. Budhadev Bhattacharyya, 2022, Philosophy of Anekanta Approach's, The tolerance and Co-exist mind, Jainsm and Jaina Culture in India, Edited by Projit Kumar Palit, Kaveri Books, New Delhi, p-247-48
17. Gita Meheta, 2010,Ecological Insight in Jainism,at Institute of Gandhian Studies, Gouripur, Wardha

উপনিষদ শিক্ষার লক্ষ্য ও মানবধর্ম

ডঃ জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন উপনিষদগুলো বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সংহিতা অথবা ব্রাহ্মণ অথবা আরণ্যক অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। শংকরাচার্য কৌষীতকি উপনিষদ ছাড়া বাকি এগারোটির ওপর ভাষ্য লিখেছিলেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মজ্ঞান ও আত্ম-উপলব্ধি। প্রাচীন ঋষিরা জাগতিক সুখ দু:খের অতীত এক উপলব্ধির সন্ধান করেছিলেন।

প্রাচীন শিক্ষার লক্ষ্যই ছিল জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের কথা উল্লেখ করা যায়।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে বৈদিক দেবদেবীদের উদ্দেশ্য করে স্তুতি নিবেদনের জন্য কর্মকান্ডর পাশাপাশি আরণ্যক উপনিষদের কালে গভীর জ্ঞানতৃষ্ণা লক্ষিত হয়। উপনিষদই ছিল জ্ঞানতত্ত্বের ভান্ডার। উপনিষদের জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে মানবধর্মের বিভিন্ন দিক বিধৃত হয়েছে। উপনিষদ আত্মজ্ঞান লাভের আকর। নতুন নতুন জ্ঞান ও মেধার সন্ধানে বৈদিক ঋষিরা ক্রমাগত জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছিলেন। শুধু ঋষিরাই নন, কোন কোন রাজর্ষিও ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ব্রতী হন। যেমন রাজর্ষি জনক ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য যাজ্ঞবল্ক্যর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে আছে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো। এই উপদেশ আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীদের জন্য, যাঁরা ত্যাগ ও নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করবেন। এখানে বলা হয়েছে ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করতে হয়। উপনিষদ ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য নির্দেশ করে। সামগ্রিক কল্যাণের জন্য দুটোই প্রয়োজন।

বিশ্বে যা কিছু আছে, সবই এক মহাসত্তার দ্বারা পরিবৃত। এক অখণ্ড বিভেদহীন চিন্তাধারা উপনিষদে লক্ষিত হয়, যা বর্তমান যুগের পক্ষে আদর্শ।

"মা গৃধ কস্যস্বিদ্ ধনম্।" এই শিক্ষা বর্তমান যুগে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক, যেখানে চুরি অপহরণ এত বেশী বেড়ে গেছে।

ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে "কুর্ব্বনেবেহ কর্মাণি....."। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে অনধিকারী সাধারণ মানুষদের জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান বিহিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দও উপনিষদ ও বেদান্ত তত্ত্বের প্রচারে আত্মনিয়োগ

করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রাচীন উপনিষদগুলোর ব্যাখ্যা ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছে। ফলে মানুষের উপনিষদ চর্চার সুযোগ ঘটেছে।

উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান আহরণ বিভিন্ন রীতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পিতা পুত্রের আলোচনা দৃষ্ট হয়। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পিতা অরুণি ও পুত্র শ্বেতকেতুর কথা আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বরুণ ও ভৃগুর কথোপকথন আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। এখানে সম্পর্কের বাইরে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান মুখ্য হয়ে উঠেছে।

উপনিষদে মানুষের প্রকৃতি ও ইচ্ছা অনুযায়ী শ্রেয় ও প্রেয় এই দুটি শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়। দেহ ও পার্থিব বিষয়ের পরিতৃপ্তি হল প্রেয়, আর সামাজিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর স্বার্থ বা সামগ্রিক কল্যাণ সাধনকে বলে শ্রেয়। শ্রেয়কে গ্রহণ করলে কল্যাণ হয় (কঠ ১/২/১)। এক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থের থেকে গোষ্ঠী স্বার্থ বড়--এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টি দূর হবে। বর্তমানে এই চিন্তার বড়ই প্রয়োজন।

উপনিষদের ঋষি একাধিক আদর্শের কথা বলেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের গল্প থেকে জানা যায় প্রজাপতি সমাবর্তনের দিন তিন শিষ্যকে উপদেশ দেন - "দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম ইতি"। ঋষি তিনটি সদগুণ অভ্যাসের কথা বলেছেন আত্মদমন কর, দান কর এবং দয়া কর (বৃহদারণ্যক, ৫/২/৩)। এই তিনটি সদগুণের অভ্যাস মানব কল্যাণের পথ সুগম করে--এ কথা বর্তমান যুগেও অস্বীকার করা যায় না।

তবে আত্মদমন ও ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ থাকলেও অন্যদিকে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, আচার্য সমাবর্তনের দিনে অন্তেবাসীকে উপদেশ দিচ্ছেন, "সত্যকথা বলবে। ধর্ম আচরণ করবে। বেদপাঠ থেকে বিরত থাকবে না। আচার্যকে প্রিয় উপহার দেবে। বংশধারাকে অব্যাহত রাখবে।" (তৈত্তিরীয় ১/১১/১)। সত্য কথা বলা ও ও ধর্ম আচরণ করা মানব কল্যাণ তরান্বিত করে। এর প্রাসঙ্গিকতা আজও আছে। এখানে আচার্য শিষ্যকে সংসার ধর্ম পালনের উপদেশ দিয়েছেন। মানব জাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও জরুরী, তাই এই উপদেশ।

কর্তব্য কর্মের প্রতিও নীতি নির্দেশিত হয়েছে। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত সমাবর্তনের দিন আচার্য উপদেশ দিয়েছেন, "যা অনবদ্য কর্ম, তাই হল কর্তব্য কর্ম। অন্য প্রকৃতির কর্ম বর্জন করে সেই কর্মই করা উচিত" (তৈত্তিরীয় ১/১১/২)। এভাবে সংসার ও সমাজ

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপনিষদের নীতির বাস্তব প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

ঈশোপনিষদের ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, যিনি ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত ভূতকে নিজের আত্মাতে দর্শন করেন এবং সমস্ত ভূতের মধ্যে নিজের আত্মাকে দর্শন করেন,তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না। এখানে একত্ব দৃষ্টির দ্বারা ঘৃণাবোধ দূর হয় এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে ঘৃণার দ্বারাই বিভেদ সৃষ্টি হয়। তাই উপনিষদের এই বাণী মানুষকে ঘৃণা ও বিভেদ থেকে সচেতন করবে। আত্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্ম পর ভেদ থাকে না। ভেদবুদ্ধি থেকে যে বিদ্বেষ ও সংকোচ জন্মায় তা থেকে বিশ্বে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই উপনিষদ এ বিষয়ে বিশেষ অবগত করে।

ঈশোপনিষদের সপ্তম মন্ত্রে উল্লিখিত সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মায় সর্বভূত এই জ্ঞান সাধনা লব্ধ অনুভূতি। এই অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই জীব চৈতন্য নিজেকে বিস্তার করতে পারে। এই প্রকার দৃষ্টি লাভ করলে মানুষের দু:খ ও মোহ দূর হয়। এই অবস্থায় পরম আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি সম্ভব হয়। শোক, দু:খ, মোহ অজ্ঞানের কারণ। উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শন আত্মজ্ঞানীদের অজ্ঞান বিনষ্ট করার উপদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে মানবসত্তার শোক নাশের তথা দু:খের ঐকান্তিক বিনাশের কথা বলে। মোহ তথা বাসনা নাশের কথা বলে।

গৌতম বুদ্ধও বিশ্বমানবতার কল্যাণে যে ধর্ম প্রচার করেছেন, তার মূল লক্ষ্য হল নির্বাণ লাভ। নির্বাণ লাভের দ্বারা তৃষ্ণার বন্ধন ছিন্ন হয় অর্থাৎ বাসনা মুক্তি ঘটে এবং রাগ-দ্বেষ মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়। তৃষ্ণা বা বাসনার বিনাশ হলে পুনর্জন্ম রোধ হয়। জন্ম মৃত্যুর পরিক্রমাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় 'ভবচক্র' বলা হয়। এর থেকে মুক্ত না হলে দু:খের অবসান ঘটে না। দু:খের পরিপূর্ণ নিবৃত্তিই হল 'নির্বাণ'।

ঈশোপনিষদে যেমন দু:খ ও মোহ বা বাসনা নাশের কথা আছে, বৌদ্ধ ধর্মেও বলা হয়েছে দু:খ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় নির্বাণ লাভ। নির্বাণ লাভের দ্বারাই তৃষ্ণা বা বাসনা মুক্তি ঘটে, মোহ দূর হয়।

উপনিষদের চিন্তাশীল ঋষি একই সঙ্গে কবি ও দার্শনিক হওয়ায় বিশ্বের সমস্যাগুলো তাঁর মনকে প্রভাবিত করে। সেজন্যই উপনিষদের মধ্যে জীবনদর্শন সুন্দর সুললিত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। দার্শনিক তত্ত্বগুলো আপাত বিক্ষিপ্ত আকারে থাকলেও ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবগুলো বুঝতে অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতেও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি ভূমি উপনিষদ। তাঁর নিজের কথায় "আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে।"

ব্রহ্মর অখণ্ড সত্তা দ্বারা ঈশ্বর, বিশ্ব, প্রকৃতি ও সকল মানুষের মধ্যে

বিরাজিত এক অখণ্ড সত্তাকে উপলব্ধি করা যায়। সবার মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সবাইকে উপলব্ধি করার মধ্যেই মানবপ্রেমের মূল মন্ত্র নিহিত। এর দ্বারাই গতানুগতিক জীবন থেকে মহৎ জীবনের উত্তরণ ঘটে।

উপনিষদে "ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ" এই মন্ত্র অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে,যার দ্বারা আধ্যাত্মিক (শারীরিক, দৈব), আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-- এই ত্রিবিধ বিঘ্ন থেকে শান্তি হোক বলা হয়েছে। মানবকল্যাণের সর্বোচ্চ বাণী এই নাদব্রহ্মরূপী ওঁ--এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড) উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

২) অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত উপনিষদ অখণ্ড সংকলন,হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭

৩) Radhakrishnan, Sarvepalli, Editor, History of Philosophy Eastern and Western, George Allen & Unwin Ltd

৪) Sharma, Shubhra (1985), Life in the Upanishads, Abhinav Publications.

৫) Sharma, B. N. Krishnamurti (2000), A History of the Dvaita School of Vedanta and its literature: from the earliest beginnings to our own times, Motilal Banarsidass Publishers.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের'সবুজ দ্বীপের রাজা' : এক অনন্য সৃষ্টি

ড. নির্মাল্য সেনশর্মা

স্রষ্টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পাঠককে উপহার দিয়েছেন অজস্র স্মরণীয় সৃষ্টি । এই লেখক – ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিশীল কলম বাঙালিকে করেছে মুগ্ধ – বিস্মিত । ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট সৃষ্টি 'সবুজ দ্বীপের রাজা' । পরে এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয় । এটি কাকাবাবু সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস । প্রথমটি হল 'ভয়ংকর সুন্দর' , যে উপন্যাসের পটভূমি কাশ্মীর। 'ভয়ংকর সুন্দর' উপন্যাসের কাহিনির কথক কাকাবাবুর ভাইপো সন্তু। এ উপন্যাসে বরফাবৃত কাশ্মীর আর অতীতের অজানা ইতিহাসকে মায়াময় হয়ে উঠতে দেখা যায় ক্লাস এইটে পড়া বারো-তেরো বছরের কিশোর সন্তুর কথনে । কিন্তু 'সবুজ দ্বীপের রাজা' লিখিত স্রষ্টার কলমেই , এখানে আর নেই আত্মকথন রীতির প্রয়োগ , সন্তু এবার আর কথক নয় । 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র পটভূমি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ , বিশেষ করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জারোয়া জাতি অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। কাকাবাবুর সেখানে যাওয়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ।

আটটি পর্ববা খন্ডে বিভক্ত এই মনোজ্ঞ কিশোর উপন্যাস 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র কাহিনি রহস্য আর রোমাঞ্চে পূর্ণ । উপন্যাসে পাই কাকাবাবুর অ্যাডভেঞ্চারের কথা । কাকাবাবুর সঙ্গী তার ভাইপো সন্তু । আবিষ্কারের নেশায় আর রহস্যের উন্মোচনে কাকাবাবু বেরিয়ে পড়েন অ্যাডভেঞ্চারে । লেখক – কাকাবাবুকে কোনদিনই প্রচলিত অর্থে গোয়েন্দা বলতে যা বোঝায় , তা বলতে চাননি, কাকাবাবু নিজের পরিচয় এভাবেই দিয়েছেন – 'আমি কিছু – কিছু রহস্য সমাধানের চেষ্টা করি । এগুলো সাধারণ খুনটুনের সমস্যা নয় , পৃথিবীতে এমন কতকগুলো রহস্যময় ব্যাপার আছে , যার সমাধান মানুষ এখনো করতে পারেনি । ..... আমি এরকম রহস্য সমাধানের চেষ্টা করি ।'

আসলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা অপরাধ – মুখ্য গল্পের ধারায় এসেছে নতুন বাঁক । প্রচলিত গোয়েন্দা কাহিনিতে দেখা যায় গোয়েন্দা তার পারদর্শিতায় , কর্মতৎপরতা আর বুদ্ধিমত্তায় চিহ্নিত করে অপরাধীকে, যে অপরাধী অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে , আর তাকে সনাক্তকরণই হয়ে ওঠে কাহিনির প্রধান চমক বা আকর্ষণ। কিন্তু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনিতে তেমন ভাবে আড়াল থাকে না দুষ্কৃতি বা অপরাধীর পরিচয়, দুটি বিরোধী পক্ষের মানুষের লুকোচুরি, সংঘাত আর শিহরণের মধ্যেই প্রধানত নির্ভরশীল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অপরাধমুখ্য গল্পের ভাবনা।

কোনো রহস্য উন্মোচনে কাকাবাবু এগিয়ে আসেন নিজের আকর্ষণের জন্যই। নিজেকে তিনি নিয়োজিত রাখেন পুরাতত্ত্ব ও ভূবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা অভিযান – অনুসন্ধানে, যা পুরোপুরি ব্যক্তিগত উদ্যোগে আর রহস্য – উন্মোচনের নেশার খাতিরে। আসলে সুনীল নতুন কিছু করতে চেয়েছেন প্রথাগত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির ভাবনা থেকে সরে এসে। আর এই অভিনবত্ত্ব সৃজনের জন্যই সুনীল ঢেলে সাজালেন তাঁর কাহিনি – পরিকল্পনাকে। বদলে দিলেন অভিযান – কাহিনির ধরনকেই। সুনীলের কাকাবাবুর লক্ষ্য যুক্তিসম্মত সমাধান, বিজ্ঞান বা ইতিহাসের সেইসব রহস্যের, যাদের পাওয়া যায় নি কোন মীমাংসাসূত্র বা কোন বিশেষ ঘটনার উপযুক্ত কার্যকারণ সম্বন্ধ। আসলে কাকাবাবু করে চলেন অন্য ধরনের ইতিহাসের অনুসন্ধান , তার ভাবনায় ধরা পড়ে অন্য ধরনের অপরাধ। আর সেজন্যইকাকাবাবুর এগিয়ে চলা এক অভিযান থেকে অন্য অভিযানে। আবার বৃহৎ বিশ্বের অজানা রহস্য খুলে যায় কিশোর সন্তুর চোখের সামনে, যে কাকাবাবুর ভাইপো আর অভিযানের সঙ্গী। কাকাবাবুর স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে গিয়ে স্রষ্টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন – 'কাকাবাবু ডিটেকটিভ নন, খুন – ডাকাতির তদন্ত করেন না। রহস্যময় দুঃসাহসী, অভিযানেই তাঁর আগ্রহ, সন্তুও তাতেই মেতে ওঠে।'১

কাকাবাবুর নাম রাজা রায় চৌধুরী। বয়স তার তিপান্ন-চুয়ান্নর মতো, তিনি অত্যন্ত উচ্চপদে চাকরি করতেন দিল্লিতে পুরাতত্ত্ব বিভাগে। আফগানিস্তানের পাহাড়ি পথে তাঁর জিপ-গাড়ি এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মরতে মরতে বেঁচে গেলেও কাকাবাবুর একটি পা নষ্ট হয়ে যায় চিরকালের মতো, তাই তিনি হাঁটেন ক্রাচে ভরদিয়ে। সাংঘাতিক তার মনের জোর। 'কাকাবাবু সমগ্র' – এর প্রথম খন্ডের ভূমিকায় কাকাবাবুর স্রষ্টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন – 'একবার আমি একজন খোঁড়া মানুষকে খুব উঁচু পাহাড়ে উঠতে দেখেছিলাম। তাঁর যেন একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। তখন আমি ছোট, সন্তুরই বয়েসী। সেই মানুষটিকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, অসাধারণ তাঁর মনের জোর, আর এরকম মনের জোর থাকলে মানুষ যে – কোনো বাধাকেই জয় করতে পারে। সেই মানুষটিই কাকাবাবু'।২

দুর্ঘটনার পর চাকরি ছাড়লেও কাকাবাবু বাড়িতে বসে থাকতে পারেন না, কারণ তার মধ্যে রয়েগেছে আবিষ্কারের নেশা। বই পড়ে

তিনি সন্ধান পান অমীমাংসিত রহস্যের, আর তিনি বেরিয়ে পড়তে চান সেইসব রহস্য – উন্মোচনে – 'অন্যরা বেড়াতে গিয়ে শুধু সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখে। আর কাকাবাবু যান বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে'।

সন্তুর ভালো নাম সুনন্দ রায় চৌধুরী। সন্তুর পরীক্ষা শেষ হয়েছে , এবার সে ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠবে। শেষ পরীক্ষার দিনই কাকাবাবু সন্তুর কাছে তার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখি ক্লাস টেনে উঠতে – চলা কিশোর সন্তুর কাছে বেড়াতে যাওয়া প্রসঙ্গে কাকাবাবুর প্রশ্ন ছিল , 'জাহাজে যেতে চাও , না এরোপ্লেনে?' সন্তু হয়ে উঠেছিল আনন্দে আত্মহারা, ধক্ করে উঠেছিল তার বুকের মধ্যে, আসলে – 'খুব বেশি আনন্দ হলে বুকের মধ্যে এরকম ঢিপঢিপ করে। ঠিক ভয়ের মতন। মনে হয়, হবে তো? শেষ পর্যন্ত হবে তো?'

সন্তুর কাছে দারুণ ব্যাপার হয়ে ওঠে কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, কারণ সেখানে রয়েছে নতুন অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি।

তারপর এল সেইদিন, যেদিন ভোরবেলা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও পাসপোর্ট গুছিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে সন্তু তার অজানা জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। তার আগে ভেজানো দরজা ফাঁক করে কাকাবাবুকে ডাকতে গিয়ে থমকে গেছিল সন্তু। কাকাবাবুকে রিভলবারে গুলি ভরতে দেখে সন্তুর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এবারের যাত্রা কি কোন বিপদ্জনক জায়গায়। এই প্রথমবার সন্তুর বিমানে চড়ার অভিজ্ঞতা হবে। দেখা যায় সন্তুর মনের ভাবনা – 'প্লেনে চাপবার কথা ভেবেই সন্তুর এত আনন্দ হচ্ছে যে, তার মুখ দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে, জীবনে প্রথম সে প্লেনে চাপবে । প্লেনটা যখন ব্যাঁকা হয়ে মাটি থেকে আকাশে ওড়ে, তখন, ভেতরের মানুষগুলো গড়িয়ে পড়ে যায় না?'

প্লেনের শেষ সীটটায় সন্তু আবিষ্কার করেছিল দুজন সাহেবকে, যাদের মধ্যে একজন সন্তুকে ইচ্ছা করে ধাক্কা দিয়েছিল পাসপোর্ট – অফিসের সামনে, কাকাবাবুকে সে জানিয়েও ছিল সে কথা।

প্লেনেই সন্তু কাকাবাবুর কাছে শুনেছিল তাদের গন্তব্যস্থল আন্দামান। তারা নামবে আন্দামানের রাজধানী পোর্টব্লেয়ারে, আন্দামান সম্পর্কে সন্তুর ভালো ধারণা না থাকলেও, আন্দামান ক্রমশ অপরূপ হয়ে দেখা দিল সন্তুর চোখে। প্লেন থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, যতদূর দেখা যায় শুধুই সমুদ্র, যে সমুদ্রের রঙ নীল, চোখ যেন ঝলসে যায় জলের ওপর ঠিকরে পড়া রোদে, জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে অপরূপ দৃশ্য সন্তুকে অবাক করে দিল। এ দৃশ্য সে দেখেছে ছবির বইয়েতেই – '..... এখানে সমুদ্রের জল একেবারে গাঢ় নীল রঙের, এত

গাঢ় যে , মনে হয় কলম ডুবিয়ে অনায়াসে লেখা যাবে , তার মাঝখানে ছোট – ছোট দ্বীপ।' আন্দামানে রয়েছে অনেকগুলো দ্বীপ। পরে সন্তু শুনেছিল যার সংখ্যা দুশোর বেশি।

অপূর্ব আন্দামানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ছোটছোট পাহাড় আর পাহাড়ে অজস্র গাছপালা রয়েছে প্রতিটি দ্বীপেই, ভাবাই যায় না পৃথিবীতে এখনো রয়েছে এত গভীর বন, বড় বড় গাছ, আর 'সেই নীল রঙের সমুদ্রের মধ্যে সবুজ সবুজ দ্বীপ, দ্বীপগুলোর ধারে ধারে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে ধপধপে সাদা ফেনা ছড়িয়ে দিচ্ছে'।

বাড়ি ঘর নেই বেশিরভাগ দ্বীপেই। একটু ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন মাটি ছুঁল, প্লেন থেকে নেমে তাদের সঙ্গে পরিচয় হল মি. দাশগুপ্তর, যিনি গাড়ি নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দাশগুপ্ত তাদের নিয়ে এলেন থাকার জন্য বুক করে রাখা 'টুরিস্ট হোমে'র ঘরে। আন্দামানে পৌঁছানোর পর দাশগুপ্তর সঙ্গে কাকাবাবুর কথায় সন্তু জানতে পেরেছিল, কোন্ রহস্যের উন্মোচনে কাকাবাবুর আন্দামানে আসা।

দাশগুপ্তকে কাকাবাবু জানিয়েছিলেন কিছু লোকের নিরুদ্দেশ বা খুনের খোঁজ নিতে তিনি আসেননি, সেগুলো পুলিশের দায়িত্ব, তিনি এসেছেন রহস্য-উদ্ধারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে' সেখানে এত বৈজ্ঞানিক আসার কারণ খুঁজতে, যারা সেখানে এসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল – 'রহস্য হচ্ছে, এইসব বৈজ্ঞানিকরা এখানে এসেছিল কেন? প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু বৈজ্ঞানিক এখানে এসেছে খুন হবার জন্য বা নিরুদ্দেশ হবার জন্য? বৈজ্ঞানিকরা এত বোকা হয় না। তারা এসেছিল নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, এই উদ্দেশ্যটা যে কী, তা এখনো জানা যায় নি, আমি এসেছি সেটা জানতে।' কাকাবাবু জানিয়েছেন তাদের সঙ্গে প্লেনে আসা সাহেব দুটোরও নিশ্চয় রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য।

দাশগুপ্তর ব্যবস্থা করা লঞ্চে তারা বেরিয়ে পড়েছেন সমুদ্রে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অঞ্চল বেশ দুর্গম। এখানে নানা ধরনের জনজাতির বাস। মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরিরও দেখা মেলে দ্বীপগুলিতে। একসময় আন্দামানের দ্বীপগুলিতে পাঁচ ধরনের আদিবাসী ছিল। তার মধ্যে সেন্টিনেলিজরা আর জারোয়ারা অত্যন্ত হিংস্র, বাকিরা শান্ত হয়ে গেছে। অনেক দূরে আলাদা দ্বীপে থাকে সেন্টিনেলিজরা। হিংস্র জারোয়াদের অবস্থান খুব বেশি দূরে নয় – দক্ষিণ আর মধ্য আন্দামানের গভীর বনের মধ্যে থাকে তারা। জারোয়ারা আবহমান কাল ধরে বসবাস করে লোকচক্ষুর আড়ালে। তারা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়। সাধারণ মানুষ জারোয়াদের এলাকায় যায় না। ভারত ভূখন্ডের

সঙ্গে আন্দামানের যোগাযোগ ঘটে মারাঠাদের নেতৃত্বে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে, এখনও তথাকথিত সভ্য মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে আন্দামান ও নিকোবরের বেশ কিছু দ্বীপ।

প্রায়শই শান্তিপূর্ণ হয় নি তথাকথিত সভ্য মানুষদের সঙ্গে জারোয়াদের সাক্ষাৎ। দেখা গেছে কিছু জারোয়াকে পোর্টব্লেয়ারে আনা হয়েছিল আধুনিক জীবন ও সমাজের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য। কিন্তু তাদের জারোয়া সমাজ আর গ্রহণ করেনি , দ্বীপে ফিরে যাবার পর।

'সবুজ দ্বীপের রাজা' উপন্যাস লেখায় নিশ্চয়ই কাজ করেছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সচেতন – বোধ। আর উপন্যাসটি সেই সময়ই লেখা যখন আধুনিক সমাজের মধ্যে নতুন করে আগ্রহের সঞ্চার ঘটতে শুরু করেছে জারোয়াদের নিয়ে, ওদের জীবনধারা নিয়ে। জারোয়াদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই ছিল অজানা , যখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন এ উপন্যাস।

ক্রমশ আন্দামানে কমছে আদিম জনজাতির সংখ্যা। আন্দামানের কাহিনি কিন্তু বারে বারে তথাকথিত সভ্য মানুষের বিপক্ষেই কথা বলেছে – তাদের লোভের কথা, হিংসার কথা। তথাকথিত সভ্য মানুষদের, বিশেষত পশ্চিম দেশের মানুষদের সেখানে যাওয়া আন্দামানের অন্যতম প্রধান সমস্যা, আর তারা যেন সেখানে সভ্যতার বিষ ছড়িয়ে দিতে চায়। তথাকথিত সভ্য মানুষদের নির্মম বিশ্বাসঘাতকতাও আন্দামান প্রত্যক্ষ করেছে। এছাড়াও আর একটি দিকের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জড়িয়ে রয়েছে আন্দামানের ইতিহাসের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে চলে আসে বিখ্যাত সেলুলার জেলের কথা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাজদন্ডে দন্ডিত করে বন্দি হিসেবে এখানে পাঠানো হতে থাকে ।

দেখা গেছে মি. দাশগুপ্ত কাকাবাবু ও সন্তুকে নিয়ে মোটর বোটে করে দ্বীপ ভ্রমণে বের হলেন, খানিকটা ফিকে নীল আর সবুজে মেশানো তীরের কাছের সমুদ্রের জল। কিছুটা দূরে জলের রং গাঢ় নীল, দূরে দূরে দৃশ্যমান ছোট ছোট দ্বীপ। মোটর বোট গভীর সমুদ্রে পড়ল একটু পরেই। বোটের চালক শঙ্করনারায়ণ, তার সঙ্গে রয়েছে আরও দুজন। সী সিকনেসের জন্য সন্তু কিছুটা অসুস্থ বোধ করছিল। যেতে যেতে দাশগুপ্ত জঙ্গলের মধ্যে জারোয়াদের অবস্থান নির্দেশ করল। সন্তুর 'জারোয়া কী?' এই প্রশ্নের উত্তরে দাশগুপ্ত জানিয়েছিল – 'জারোয়া হচ্ছে খুব হিংস্র একটা জাত। তারা জামাকাপড় পরে না, তারা বিষাক্ত তীর মারে – আমাদের মতন লোক দেখলেই তারা খুন করতে চায়।'

কাকাবাবু একাকী বোট চালিয়ে জারোয়াদের জঙ্গলে যেতে গিয়ে ব্যর্থ হন, বোটে ডিজেল কম থাকায়। রঙ্গতের ডাকবাংলোয় কাকাবাবুকে

দেখা গেছে দারুণ গম্ভীর হয়ে থাকতে, কারো সঙ্গে তখন তিনি কথাও বলছেন না। কাকাবাবুর এ স্বভাবের সঙ্গে সন্তু পরিচিত, - 'অনেক লোক শুধু নিজের বাড়ির লোকজন কিংবা টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু কাকাবাবু এমন সব জিনিস নিয়ে চিন্তা করেন , যার সঙ্গে তাঁর নিজের কোন সম্পর্কই নেই। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা এসে আন্দামানে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে , এ জন্য কাকাবাবুর রাত্তিরে ঘুম হবে না কেন? কত লোক তো তবুও ঘুমোয় !' বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও কাকাবাবু নেমে পড়েন জারোয়া দ্বীপে পৌঁছানোর জন্য। আসলে কাকাবাবু বুঝতে পেরেছিলেন ঐ জায়গাতেই রয়েছেআসল রহস্য। সন্তুও মোটর বোট থেকে জলে লাফিয়ে পড়ে। তারা এগিয়ে চলে জারোয়া দ্বীপের দিকে। দাশগুপ্ত পোর্টব্লেয়ারে এসে এস. পি. কে সব কথা জানায়। খবর পৌঁছায় জারোয়াদের ভাষা জানা মানুষ দারুণ সাহসী প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রতীম সিং – এর কাছে।

জারোয়া দ্বীপে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে থাকে সন্তু আর কাকাবাবু। তাদের চোখে পড়ে দ্রুত ধাবমান কয়েকটি হরিণ। গুলিবিদ্ধ এক জারোয়ার মৃতদেহ তারা দেখে । ঝর্নার জলে সন্তু তার তৃষ্ণা মেটায়। ঝর্নার জলে ভেসে যায় কাকাবাবুর ডান হাতের ক্রাচ। এরপর আর একটি গুরুতর আহত সারা গায়ে রক্তমাখা গুলিবিদ্ধ জারোয়াকে তারা দেখতে পায়, সন্তু ও কাকাবাবু প্রাণপণে চেষ্টা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু লোকটি সন্তুকে আক্রমণ করে বসে, কাকাবাবু বাধ্য হন আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলতে। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার, এরকম পরিস্থিতির মধ্যেও কাকাবাবুর উৎসাহে কমতি নেই। তিনি গোটা দ্বীপটা দেখতে চান ঘুরে। একটু পরে শোনা যায় একসঙ্গে অনেক লোকের পায়ের শব্দ। এর মধ্যে শুরু হয়ে যায় জারোয়াদের সঙ্গে সাহেবদের যুদ্ধ। গুলি আর তীরের লড়াই। এ যুদ্ধ চলল মিনিট দশেক। জারোয়ারা তীর ছোঁড়া বন্ধ করে পিছিয়ে আসে। তারা ভয় পেয়েছে এই কারণে যে বিষ মাখানো তীরের আঘাতে সাহেবরামরছে না, বরং ইনজেকশন নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছে। কাকাবাবু মনে মনে ভাবলেন, 'সাহেবরা এত আটঘাট বেঁধে এখানে এসেছে কেন?' নিশ্চয়ই এখানে সাংঘাতিক কোনো দামী জিনিস আছে। এর আগে – আগে এসেছে বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এদের বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয় না, কোন বৈজ্ঞানিক গুলি করে মানুষ মারে না। এরা নিশ্চয়ই ডাকাত-টাকাত হবে।'

সন্তু মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও কাকাবাবুরই কথায় কাকাবাবুকে রেখে প্রথমে ফিরে চলে। সন্তুর অনুভব – 'মনের মধ্যে ভীষণ খারাপ লাগছে। কাকাবাবুকে এরকমভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া কি

ঠিক হল? একলা এই ভয়ংকর জঙ্গলের মধ্যে উনি কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবেন? নিজে ভালো করে হাঁটতেও পারেন না, অথচ কাকাবাবু যে কিছুতেই শুনবেন না অন্য কারুর কথা।' কিন্তু সন্তু আবার ফিরে এল, ঝোপের কাছে এসেও কাকাবাবুকে দেখতে পেল না। সন্তু ভাবল – 'না , যদি মরতে হয় তো কাকাবাবুর সঙ্গে নিজেও মরবে।' সন্তুর চোখে পড়ল জঙ্গলের মধ্যের এক অদ্ভুত আলো – 'খানিকটা যাবার পর সে জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দেখতে পেল। সেই আলোটা দেখেও ভয় পাবার কথা। এই জঙ্গলের মধ্যে এরকম আলো আসবে কোথা থেকে? একদম নীল রঙের আলো। গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে সেই আলোর ছটা। কালী পুজোর সময় ম্যাগনেসিয়ামের তার পোড়ালে এরকম নীল আলো হয়। সন্তু যত এগোতে লাগল ততই আলোটা উজ্জ্বল হতে লাগল , যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সন্তু কাকাবাবুর কাছে শুনেছিল যে, জারোয়ারা আগুনই জ্বালাতে জানে না, তা এরকম আলো এখানে কে জ্বেলেছে?' জঙ্গলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আলোটা। তাই সন্তু এগোলো নদীর ধার ছেড়ে সেদিকে। সন্তু কাকাবাবুকে দেখতে পেল না। কিন্তু দেখল সাহেবগুলোর হাত পা জংলী লতা দিয়ে এমন শক্তভাবে বাঁধা রয়েছে যে তারা নড়াচড়া করতেও পারছে না। সন্তুর চোখে বুড়ো রাজা প্রথম ধরা পড়েছিল এভাবে – 'লোকটি অসম্ভব বুড়ো , মনে হয় নব্বই বা একশো বছর বয়েস। ছোট্ট খাট্টো চেহারা, পিঠটা একটু বেঁকে গেছে। মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখেও সাদা দাড়ি, লোকটির ভুরু দুটিও পাকা, লোকটি একটি লাল রঙের ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরে আছে। গায়ে একটা লাল রঙের চাদর। অন্য কোনো জারোয়া জামা কাপড় কিছুই পরে না। এই বুড়ো লোকটিকে জারোয়া বলে মনেও হয় না, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, মাথার চুলও কোঁকড়ানো নয়।' গাছের আড়াল থেকে সন্তু লক্ষ্য করেছিল এক সাহেবকে পুড়িয়ে মারা। জারোয়াদের বুড়ো রাজার নির্দেশে দ্বিতীয় সাহেবকে আগুনে ফেলার আগেই রিভলবার হাতে উপস্থিত হতে দেখা গেল কাকাবাবুকে। কাকাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বুড়ো রাজা বলেছেন – 'তোমাকে কে বলেছে, এই জারোয়ারা অসভ্য' আর এই সাহেবরা কিংবা তোমরা সভ্য? তোমাদের আমি ঘৃণা করি।'

বুড়ো রাজা আঘাত করে কাকাবাবুর হাত থেকে ফেলে দিলেন রিভলবার, কাকাবাবুকে গম্ভীর গলায় বললেন – 'তোমাদের সব কটাকে আমি এক্ষুণি যমের বাড়ি পাঠাব! আমরা জারোয়ারা এখানে জঙ্গলের মধ্যে আপন মনে থাকি। আমরা কারুর কোন ক্ষতি করি না, তোমরা কেন আমাদের বিরক্ত করতে আস?'

বুড়ো রাজার বিশ্বাস সাহেবরা এবং কাকাবাবু চুরি করতে এসেছে

যে পাথর থেকে আগুন বেরোচ্ছে, সেটা। কাকাবাবুর বিপদে বেরিয়ে এল সন্তু। বুড়ো রাজাকে বোঝানোর চেষ্টা করল তাদের এখানে আসার কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই। তাছাড়া কাকাবাবু একজন পন্ডিত লোক। জারোয়াদের বুড়ো রাজা বাংলায় কথা বলছেন, কাকাবাবু বুঝতে পেরেছিলেন জারোয়াদের বুড়ো রাজাই বহু বছর আগে আন্দামানের জেল থেকে পালানো বিপ্লবী গুণদা তালুকদার। গুণদা তালুকদার কাকাবাবু ও সন্তুর কাছ থেকে জানলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের কথা। কাকাবাবুর কাছে বুড়ো রাজার প্রশ্ন ছিল – '.....গুণদা তালুকদারকে এখনো লোকে মনে রেখেছে?' কাকাবাবু বলেছিলেন – 'নিশ্চয়ই! আপনার ছবি ছাপা হয়েছে কতবইতে। অবশ্য সে ছবি দেখে এখন আপনাকে চেনা যায় না। আপনার জন্মদিনে উৎসব হয় অনেক জায়গায়।'

গুণদা তালুকদার জানালেন, তার সঙ্গে বাইরের কোন লোকের কথাই হয়নি গত পঞ্চাশ-ষাট বছর। বিপ্লবী গুণদা তালুকদার, আজকের জারোয়াদের বুড়ো রাজা জানিয়েছিলেন – 'আমি একটা ছোট ভেলা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলাম, ঝড়ে সেই ভেলা উল্টে গেল। আমি মরেই যেতাম। অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপে এসে ঠেকেছিলাম। আমাকে এরা মারেনি কেন জানি না । তখনো আমার একহাতে হাতকড়া ঝুলছিল। এরা মোটেই হিংস্র নয়। এদের যদি কেউ বিরক্ত না করে, এরা কখনো অন্য মানুষকে মারে না। এরা আমাকে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করে তুলেছিল। সে কতকাল আগের কথা।' কাকাবাবুর কাছ থেকে জারোয়াদের সভ্য করে তোলার কথায় , উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন জারোয়াদের বুড়ো রাজা। বলে ওঠেন – 'চুপ, ও কথা বলো না! সভ্য মানে কী? তোমরা সভ্য আর এরা অসভ্য? এখানে কেউ চুরি করে না, মিথ্যে কথা বলে না। এখানে সবাই খাবার একসঙ্গে ভাগ করে খায়। এখানে কোনো রোগ নেই। এর থেকে বেশি সুখ মানুষ আর কী চায়? আমি এদের বারণ করেছি তোমাদের মতনসভ্য লোকেদের সঙ্গে মিশতে। তোমরা এদের নষ্ট করে দেবে।'

গুণদা তালুকদার বিশ্বাস করেন এরা তথাকথিত সভ্যদের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য, কাকাবাবুর দিকে গুণদা তালুকদার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন – 'তোমরা কেন জারোয়াদের ওপর অত্যাচার করতে আস?' তাছাড়া বুড়ো রাজা ভেবেছিলেন আগুন-জ্বলা পাথরটার ওপর কাকাবাবুরও নিশ্চয়ই লোভ আছে।

কাকাবাবু বলেন – 'ওটার কথা আমি জানতামই না , তবে আন্দাজ করেছিলাম, এরকম একটা মহা-মূল্যবান জিনিস এখানে আছে। সাহেবরা আগেই টের পেয়েছে নিশ্চয়ই।' গুণদা তালুকদা্রের প্রশ্নের

উত্তরে কাকাবাবু বলেছিলেন আগুন-জ্বলা পাথরটা নিশ্চয়ই উল্কা অথবা তা 'অন্য গ্রহের ভাঙা টুকরো।' এটা জ্বলছে বহু বছর ধরে। আমাদের পৃথিবীতে নেই এমন কোন ধাতু, যা নিশ্চিত ভাবেই রয়েছে এটার মধ্যে। আর সাংঘাতিক দাম হবে সেই নতুন ধাতু আবিষ্কৃত হলে, হৈ – চৈ পড়ে যাবে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে। গুণদা তালুকদারের প্রশ্ন ছিল, সভ্য মানুষ কেন চুরি করতে চায় 'প্রকৃতির দান' , জারোয়াদের সেই আগুন। গুণদা বলেন, তিনি কাকাবাবুদের ছেড়ে দিতে পারেন এই আগুনের কথা কখনও কাউকে না বলার শর্তে। কাকাবাবু বলেন, তিনি তাদের সঙ্গে স্বাধীন দেশে নিয়ে যেতে চান বিপ্লবী গুণদা তালুকদারকে ।

এর মধ্যে জারোয়াদের দ্বীপে হেলিকপটারে করে উপস্থিত হলেন পরেশ দাশগুপ্ত ,হোম সেক্রেটারি কৌশিক ভার্মা, পুলিশের এস. পি. মিঃ সিং , চারজন সৈন্য এবং 'ধপধপে সাদা দাড়িওয়ালা' শিখ প্রীতম সিং। বন্দী করা হল সাহেবগুলোকে।

সন্তুর একান্ত অনুরোধে গুণদা তালুকদার কয়েকদিনের জন্য জারোয়াদের দ্বীপ থেকে আসতে রাজী হন। সন্তুকে জড়িয়ে ধরেতিনি কেঁদেও ফেলেন। বুড়ো রাজার মনে পড়ে যায় নিজের ছোট ভাইয়ের কথা । অনেক বছর আগে জেলে আসার সময় সে ছিল সন্তুরই সমবয়সী। বুড়ো রাজা কাকাবাবুদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন , জারোয়াদের কেউ ক্ষতি করবে না, তাদের দ্বীপে কেউ আসবে না, নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না জারোয়াদের পবিত্র আগুন, আর নিজেরা যেরকম চায় সেভাবেই জারোয়াদের থাকতে দিতে হবে।

হেলিকপটারেতোলা হল বুড়ো রাজাকে। বোঝা যায় একদা বিপ্লবী গুণদা তালুকদার জারোয়াদের হৃদয়ে কতখানি জায়গা করে নিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি হয়ে উঠেছেন সবুজ দ্বীপের রাজা। দেখা যায় আবেগ – শ্রদ্ধা – ভালোবাসার কি অপরূপ প্রকাশ। হেলিকপটারে তোলার সময় প্রতিটি জারোয়া একটা অদ্ভুত করুণ শব্দ করতে লাগল মাটিতে মুখ গুঁজে। এটা ওদের কান্না, এ সময় ওরা কাউকে মুখ দেখায় না। বুড়ো রাজাকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল কয়েকটি জারোয়া মেয়ে , তারা কিছুতেই ওঁকে যেতে দিতে চায় না, বোঝাতে গিয়ে জল পড়ল বুড়ো রাজার চোখ দিয়েও । মাটিতে মুখ গোঁজা প্রত্যেক জারোয়ার গায়ে হাত দিয়ে তিনি কথা দিলেন, ফিরে আসবেন কয়েক দিনের মধ্যে। অবাক হোম সেক্রেটারি কৌশিক ভার্মা। মানুষ যে মানুষের হৃদয়ে কতখানি জায়গা করে নিতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

হেলিকপটার আকাশে যখন উড়ল তখন জারোয়ারা উঠে দাঁড়িয়ে

একসঙ্গে দুহাত তুলে করে উঠল চিৎকার, তাদের দিকে হাত নাড়তে লাগলেন বুড়ো রাজা।

অল্প সময় লাগল পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছতে। বুড়ো রাজা আকাশ থেকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন 'ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত সেলুলার জেলের দিকে।' যেটা তখনও পোর্টব্লেয়ারের বাড়িগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু, যে সেলুলার জেল থেকে একদিন তিনি পালিয়েছিলেন – 'আজ সত্যিই সেখানে রাজার মতন ফিরে আসছেন।' বিশেষ বিমানে কলকাতায় পৌঁছলেন বুড়ো রাজা । বিমান বন্দরে ধ্বনি উঠল – 'গুণদা তালুকদার জিন্দাবাদ।'

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে ভি. আই. পি. রোড , কাঁকুড়গাছি, মানিকতলা পেরিয়ে বিবেকানন্দ রোড দিয়ে গাড়ি যখন ছুটছে তখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন বুড়ো রাজা। ডাক্তারের চিকিৎসায় বুড়ো রাজার সাময়িক জ্ঞান ফিরল, বুড়ো রাজা তখনই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন – '..... তোমাদের এখানে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। এখানকার বাতাস এত খারাপ , এখানে এত শব্দ, এত মানুষ, এত বাড়ী ..... আমার সহ্য হচ্ছে না' ..... রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম মানুষ ভিক্ষে করছে, রোগা রোগা ছেলে, না না, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো ....' । অনেক কষ্টে ফিসফিস করে বুড়ো রাজা জানালেন আর পারছেন না , তার কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে, বাতাসে এত ধুলো তিনি সহ্য করতে পারছেন না, শব্দ তাকে কষ্ট দিচ্ছে।

জোর করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি পড়ে গেলেন। মৃত্যুর ঠিক আগে সবুজ দ্বীপের রাজা খুব ধীরে ধীরে নিজের মনে বলেছিলেন – 'আমি কেন এলাম! কত ভালো জায়গায় ছিলাম আমি .... সেখানে বাতাস কত টাটকা .... পাখির ডাক, গাছের পাতার শব্দ, আর ঝর্নার জলের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই, সেখানে কেউ ভিক্ষে করে না, সেখানে কত শান্তি , সেই তো আমার স্বর্গ! কেন এলাম, আমাকে নিয়ে চলো। .... এক্ষুণি এক্ষুণি .... আমি যাব .... আঃ।' এরপরেই স্তব্ধ হয়ে যায় 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র কণ্ঠস্বর । কাকাবাবুর চোখে সন্তু জীবনে প্রথম দেখল জল, কান্না ঝরে পড়ে সন্তুর চোখ থেকে, সে নিজেকে সামলাতে পারে না।

'সবুজ দ্বীপের রাজা' উপন্যাসে লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোলাহল মুখরিত, লোভ-লালসায় পূর্ণ তথাকথিত সভ্য জগৎথেকে অনেক দূরের স্বপ্ন – রাজ্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে, তার ভূমির সন্তানদের যাবতীয় সমস্যাসহ চিত্রিত করেছেন। আন্দামানের অসহায়তা ও বিপন্নতা এক চিরকালীন সত্য, সভ্য-বিশ্বের লোভ – লালসার কাছে। তাই শুধু কিশোর অ্যা ডভেঞ্চার কাহিনিই নয়, সভ্যতার উপদ্রব আর শক্তিতে

বিপন্ন অসহায় মানুষের ট্র্যাজেডি ছড়িয়ে রয়েছে 'সবুজ দ্বীপের রাজা' উপন্যাসে। ইতিহাসও যে এখানে বলেছে নিজেরই কথা।

'সবুজ দ্বীপের রাজা' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে জারোয়া অধ্যুষিত সবুজ দ্বীপ, জারোয়ারা নিজেদের মতো করেই বাঁচত। তাদের জীবনে ছিল না কোন অশান্তি, তথাকথিত সভ্য সমাজের সঙ্গে তারা সংযোগ রাখতে চায় নি । এর মূলেও রয়েছে রাজার নির্দেশ। রাজার নির্দেশেই তারা প্রতিরোধ করত আক্রমণকারী বিদেশী শত্রুদের। এই রাজার কথা তারা বাইরের কাউকেই জানায় নি , যা অবাক করে দিয়েছিল প্রীতম সিংকেও । তাকে পর্যন্ত জারোয়ারা জানতে দেয়নি যে তাদের রয়েছেন একজন বাঙালি রাজা। এই বাঙালি রাজা, আন্দামানের সেলুলার জেল থেকে পালানো বিপ্লবী গুণদা তালুকদার , পৌঁছে ছিলেন জারোয়াদের দ্বীপে , সেখানে তিনি পেয়েছিলেন অন্যরকম পৃথিবীর সন্ধান। সেখানকার মানুষদের তার মনে হয়েছিল উন্নততর ----------স্বাধীনতা , সমানাধিকার, মুক্ত জীবনধারণা প্রভৃতি নানা দিক থেকেই। শান্তিময় , সুখী , মানবতার আলোয় উদ্ভাসিত, তথাকথিত সভ্যজগৎ থেকে দূরে দ্বীপাঞ্চলের অরণ্যভূমিতে এমন মানুষগুলি ও তাদের সুন্দর সরল জীবনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন – যেখানে তিনিই হয়ে উঠতে পেরেছিলেন প্রকৃতই রাজা।

জারোয়া অধ্যুষিত দ্বীপে একটি বিশেষ রহস্যের – উন্মোচনে সন্তুকে নিয়ে কাকাবাবুর যাওয়া। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে এর কাহিনি, যা পাঠককে শুরু থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রাখে। সন্তু করেছে কাকাবাবুকে সুযোগ্য সঙ্গদান। পাঠক পায় এক অসাধারণ কাহিনি, যার মধ্যে মিশে থাকে শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনা, রোমাঞ্চ আর রহস্য। পাঠকের মানসলোকে যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এই দুর্ধর্ষ অভিযান, রহস্যের কিভাবে গ্রন্থিমোচন হল তা, জারোয়াদের জীবন – ছবি, তাদের বুড়ো রাজার কথা আর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের ছবি। উপন্যাসে দেখি কাকাবাবুর বিচক্ষণতা – বুদ্ধিমত্তা সঙ্গে কিশোর সন্তুর সাহস, সহৃদয়তা।

এক চিরন্তন সত্য হিসেবেই দেখা দেয় তথাকথিত সভ্য পৃথিবীর লোভ-লালসার কাছে আন্দামানের এই অসহায়তা, সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। ক্রমশ কমছে আদিম জন জাতির সংখ্যা। আন্দামানের আবহমানকালের ইতিহাস যা বলে চলে, সে সত্যই উচ্চারিত হয় গুণদা তালুকদারের কণ্ঠেও ---------- নিজের অঞ্চলে, নিজেদের মতো জীবনযাপন করে চলা জারোয়াদের ক্ষতি, সভ্য মানুষদের আর তাদের লোভের সংস্পর্শে এলে। সবুজ দ্বীপের বুড়ো রাজা , সেলুলার জেল থেকে পালানো বিপ্লবী গুণদা

তালুকদার গীতা আর হাতকড়া নিয়ে পৌঁছেছিলেন জারোয়াদের দ্বীপে, খোঁজ পেয়েছিলেন অন্য এক পৃথিবীর। সব দিক থেকেই সেখানকার মানুষকে , তাদের জীবনকে , তাদের স্বাধীনতাকে, আর সব কিছুতেই সমান – অধিকারকে, অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত বলে মনে হয়েছিল তাঁর। গুণদা তালুকদারকে তৃপ্ত করেছিল দ্বীপের অধিবাসীদের স্বতন্ত্র আর সুখী জীবন।

সেখানকার আদিবাসীদের মনে স্থান পেয়েছিলেন রাজারই মতো, দীর্ঘকাল ধরে সবুজদ্বীপের অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন – কাটানো রাজা শরীর ও মনে অসুস্থ হয়ে পড়েন শহরের বিষাক্ত বাতাস, অভাবী মানুষের রূপ, আর শব্দ – যন্ত্রণায় , যেখানে তিনি তো ছিলেন হিংসাশূন্য, লোভশূন্য সবুজ দ্বীপের শান্ত পরিবেশে প্রকৃতই রাজা হয়ে। সবুজ দ্বীপের রাজার মৃত্যু শুধু কাকাবাবু বা সন্তুর চোখেই জল আনে না, আনে পাঠকের চোখেও। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেশ স্বাধীন হবার তিন দশকের মাঝেই স্বাধীন দেশের প্রকৃত রূপটিকে কিশোর উপন্যাস 'সবুজ দ্বীপের রাজা'য় ফুটিয়ে তোলেন, মৃত্যুদৃশ্যের মধ্যে দিয়ে প্রতীকায়িত করে তোলেন স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতার অনুষঙ্গকে। একদা জেল – পালানো বিপ্লবী, স্বপ্ন দেখা আদর্শবাদী গুণদা তালুকদারের কাছে গাড়ি থেকে রাস্তায় দেখতে পাওয়া ভিক্ষে করা মানুষ, রোগা ছেলে মূল্যহীন করে তোলে স্বাধীনতাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী, জেল পালানো বিপ্লবী গুণদা তালুকদার যথার্থই হয়ে উঠেছিলেন সবুজ দ্বীপের রাজা, জারোয়াদের হৃদয়ে তাদের বুড়ো রাজার অম্লান প্রতিষ্ঠা।

* 'সবুজ দ্বীপের রাজা' : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭০০০০৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। 'ভূমিকা', কাকাবাবু সমগ্র ১, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
২। ঐ ।

সাংখ্য ও যোগ সম্প্রদায়ের আধিবিদ্যক আলোচনায় ঈশ্বরের ভুমিকা ; একটি সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা

দেবেশ মুদি

অনাদি কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অধিবিদ্যামূলক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে বহুল চর্চা হয়েছে বা হয়ে চলেছে। তার মধ্যে অন্যতম আধিবিদ্যক সমস্যা হল- ঈস্বর কেন্দ্রিক সমস্যা। এই সমস্যা যে কেবলমাত্র ভারতীয় দর্শনে আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে, তা নয়, প্রাশ্চাত্য দর্শনেও এরূপ সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে। দার্শনিকগণ ঈস্বর স্বীকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেন। সাধারনত যাঁরা ঈস্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁরা নাস্তিক। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাভাবনায় 'নাস্তিক' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত, যাঁরা বেদ এ বিশ্বাস করেন না, তাঁরা হলেন নাস্তিক। যেমন – চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায়। দ্বিতীয়ত, যাঁরা ঈশ্বরে অস্তিত্বে অস্বীকার করেন, তাঁরা হলেন নাস্তিক। যেমন – চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ ও মীমাংসা সম্প্রদায়। তবে অনেক দার্শনিকই সাংখ্য সম্প্রদায়কে নিরীশ্বররূপেই গণ্য করেন।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কেন ? সাধারণ দৃষ্টি ভঙ্গিতে আমরা ঈশ্বরকে পাপের প্রায়শ্চিত্তরুপে, পূর্ণ, অসীম ও সর্বজ্ঞ শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে আরাধনা, উপাসনা ও বিশ্বাস করি। কিন্তু, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা ঈস্বরকে মূলত দুটি কারণে স্বীকার করি – প্রথমত, জগৎ সৃষ্টির নিমিত্তকারণরূপে। দ্বিতীয়ত, মোক্ষলাভের উদ্দেশ্য। তবে, এ প্রসঙ্গে 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে উদয়নাচার্য বলেন -ন্যায়াদি দর্শনে মূলত তিনটি দৃষ্টিতে ঈস্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। জগতের নির্মাতারূপে, জীবাত্মার কর্মানুসারে ফলদাতা অথবা ধর্মধর্মীরূপে, অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রীরূপে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরীয় জ্ঞান উপদেষ্টারূপে। এ সবেতেই মুখ্য ঈশ্বর সাধক হেতু জগৎ করণত্ব ও অদৃষ্টাধিষ্ঠাতৃত্ব।, এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে যোগ দর্শন কি আদৌ ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে ? যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলে অভিহিত করা হয়, তা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় ? উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে সাংখ্য দর্শনের ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যিকতা আছে কি ? যদি সাংখ্য দর্শনে ঈস্বর স্বীকার করা হয়, তাহলে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বীকৃত ? সাংখ্য দর্শনেরে সূত্রকার মহর্ষি কপিল কি প্রকৃতই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন ?

ঈশ্বরের স্বীকারের পক্ষে ও বিপক্ষে ভারতীয় ও প্রাশ্চাত্য দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে

মূলতঃ ঈস্বরের অস্তিত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য – যোগ দর্শনের যুক্তিগুলি উত্থাপিত করে তার ভিত্তিতে উপরি উক্ত প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য সমাধানের প্রচেষ্টা করব।

ন্যায় মতে, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। তিনি নিত্য, অনন্ত এবং আত্মস্বরূপ। এই জগৎ শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়নি। ঈশ্বর নিত্য পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন ও আত্মা এই সুন্দর জগৎ রচনা করেছেন। এই সকল পদার্থ ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ব্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। তিনি তাদেরকে জগৎরূপে সাজিয়েছেন মাত্র । তাঁর রচনা কৌশল এমন অদ্ভুত যে, এই জগতের জীব মাত্রেই আপন কর্মানুযায়ী সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে থাকে। তাঁরই বিধানে কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন মনুষ্যজাতি ইতর প্রাণী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। জাগতিক বস্তু সমূহেও মানুষের বিচার বুদ্ধি সাধক মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়ে এসেছে। এই মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, উপাদান কারণ নয়। ঈশ্বর শুধু স্রষ্ঠা নয়, তিনি এই জগতের রক্ষাকর্তাও বটে। জগৎ তাঁর ইচ্ছাতেই বর্তমান আছে। আবার অধর্মের প্রাবল্য উপস্থিত হলে তাঁর ইচ্ছায় জগৎ বিনষ্ট হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে অনন্ত ও নিত্য বলার কারণ এই, দেশ, কাল, মন এবং জীবাত্মা তাঁর কোন বাধা জন্মাতে পারে না। দেহের সাথে দেহীর যেমন সম্বন্ধ, তাদের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ সেইরূপ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলেও সৃষ্টিকালে যথেচ্ছভাবে তিনি সৃষ্টি করতে পারেন না। কারণ, জীবের পূর্ব জন্মার্জিত ধর্মাধর্মা এবং পাপ-পুণ্য অনুসারেই ভোগ্য জগতের সৃষ্টি করতে হয়। ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞ বলার কারণ এই যে, সকল বিষয় এবং সকল ব্যাপারেই তাঁর প্রকৃত জ্ঞান আছে। তিনি নিত্য জ্ঞান সম্পন্ন । কিন্তু তাঁর স্বরূপ নয়। তিনি ষড়ৈশ্বর্যবান বলে তাকে ভগবানও বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বর কেবল সৃষ্টি কর্তাই নয়, তিনি জীবগণের কর্মেরও নিয়ন্তা। ন্যায় মতে কোন প্রাণীই সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। এমনকি মনুষ্যের স্বাধীনতাও সীমাবদ্ধ। মানুষ ঈশ্বর কর্তৃক চালিত হয়ে থাকে, যেমন কোন বিচক্ষণ অভিভাবক তাঁর অধীনস্থ বালকের কর্ম এবং যোগ্যতানুসারে তাকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করে কল্যানের পথে প্রেরণ করেন। ফলতঃ মনুষ্যেরা তাদের আপন আপন কার্য্যের প্রযোজ্য কর্তামাত্র। ঈশ্বরই তাদের কার্যের প্রযোজক কর্তা। ঈশ্বর পাপ-পুন্যের ফলদাতা।২ তিনি নিরপেক্ষ বিচারক, সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসক।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নানা প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণরূপে গণ্য করেন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের জগৎ সৃষ্টির তত্ত্বটি কার্য কারণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কার্য-কারণ প্রসঙ্গে তাঁদের মতবাদকে বলা হয় আরম্ভবাদ। তাঁরা বলেন-

কার্যটি তার উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে না, কার্যটি হল নতুন, সৃষ্টি বা আরম্ভ হয়। কার্য-কারণ নিয়মানুযায়ী প্রতি কার্য পদার্থেরই একটি কারণ আছে। বিচিত্র বস্তু সমন্বিত এই জগতে যাবতীয় পদার্থ, যেমন- সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি পরমাণু সংযোগের ফলেই উদ্ভূত। এগুলি হল কার্য। যেহেতু, এগুলি অংশের সমষ্টি বা সাবয়ব। এগুলির অবান্তর মহত্ত্ব বা সীমিত পরিসর আছে। এদের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কারণ দু প্রকার , যথা- নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। যেমন- ঘট হল কার্য, এর উপাদান কারণ হল মাটি এবং নিমিত্ত কারণ হল কুম্ভকার। অনুরূওভাবে জগতের যাবতীয় পদার্থের উপাদান কারণ যদি ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু হয়, এদের নিমিত্ত কারণ কে বা কর্তা কে? এই সব বস্তুর উপাদান কারণগুলি নিজে নিজে সংযুক্ত হতে পারে না।যদি কোন কর্তা, এই সব উপাদান কারণগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন না করতে পারে, তাহলে আমরা এই সব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সুক্ষ্ম কলা কৌশল লক্ষ্য করি, তা কখনো সম্ভব হত না। এরুপ অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন কর্তা আছে, যার জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতি আছে। সুতরাং, সেই কর্তা অবশ্যই ঈশ্বর হবেন।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর অদৃষ্টের নিয়ন্তা। এই জগতে সকলের অবস্থা সমান নয়-যেমন, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ বুদ্ধিমান আবার কেউ বা মূর্খ। কিন্তু এই বৈষম্যের কারণ কি? আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ কর্মানুসারে ফল ভোগ করে থাকে। কার্য মাত্রই উপযুক্ত কারণের অধীন। সুতরাং, এক ব্যক্তির সুখ ও অপর ব্যক্তির দুঃখের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, পূর্বে যে কর্ম করা হল, তার ফল যদি তৎক্ষণাৎ কেউ না পায়, তবে ভবিষ্যতের জন্য কিরুপে সঞ্চিত থাকতে পারে? এর উত্তরে নৈয়ায়িকরা বলেন যে, সকল কর্মের ফল ইহ জন্মে দেখা না গেলেও তা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না, সংসারে এমন অনেক লোক দেখা যায় যারা অন্যায় কর্ম করেও সুখে দিন যাপন করে। আবার অনেক ধার্মিক ব্যক্তি আছেন, যাদের নিরন্ত্র কষ্ট ভোগ করতে দেখা যায়। কিন্তু, সুকর্মের ও কুকর্মের বিহিত ফল অবশ্যম্ভাবী। ন্যায় মতে, সুকর্মের ফল পুণ্য ও কুকর্মের ফল পাপ। কর্ম শেষ হয়ে গেলেও তজ্জনিত পাপ-পুণ্য আত্মায় অবস্থান করে। এই সঞ্চিত পাপ-পুণ্যের নামই অদৃষ্ট। তা ভবিষ্যত সুখ-দুঃখের মূল স্বরূপ। কোন ব্যক্তির বর্তমান সুখ-দুঃখ ভোগ তা অদৃষ্টেরই ফল। পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, এই অদৃষ্ট কি চেতন না অচেতন? নৈয়ায়িকরা অবশ্যই স্বীকার করেন যে, অদৃষ্ট একটি অচেতন বস্তু। কিন্তু এই অচেতন বস্তু কি প্রকারে জীবের কর্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা করতে পারে? নৈয়ায়িকরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য

ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হন; তাঁদের মতে অদৃষ্ট ঈশ্বরের বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে জীবের কর্মফল প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ অদৃষ্টের নিয়ন্তা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।

এ প্রসঙ্গে উদয়ানাচার্য তাঁর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে বলেন-

কার্য্যায়োজন ধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ
বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষচ্চ সাধ্যোবিশ্ববিদ্ অব্যয়ঃ ।

অর্থাৎ পৃথিব্যাদি কার্য হওয়ায় সকর্তৃক ঘটের ন্যায়। সকর্তৃকত্ব বলতে বোঝায় উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতিযুক্ত। তা থেকে উৎপন্ন বস্তুই সকর্তৃক। এই কার্যত্ব হেতুওনুমান থেকে ক্ষিত্যাদির কর্তারূপে ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়। সৃষ্টির আদিতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ জনক কর্ম থেকে আয়োজন। তার আশ্রয় অনুমান্টি হল- সৃষ্টির আদিকালে দ্ব্যণুক উৎপন্নকারী পরমাণুদ্বয় সংযোগকারক কর্ম আমাদের শরীর ক্রিয়ার কর্ম হলে চেতন প্রযত্ন পূর্বক। তৃতীয় হেতু, ধৃতি অর্থাৎ ধারণ। এর আশ্রয় অনুমানটি এরূপ- ব্রহ্মাণ্ডাদি ধৃতিমান হলে পতনের প্রতিবন্ধ যে প্রযত্ন তাতে অধিষ্ঠিত আকাশে পক্ষী দ্বারা ধারণ করা হয়েছে যে, কাঠ তার সমান। ধৃতির অর্থ গুরুত্বযুক্ত পতনের অভাব। ব্রহ্মাণ্ডাদি বিনাশী হওয়ায় পাট্যমান বস্ত্রের সমা্। প্রযত্নবান কোন চেতন থেকে কোন বিনাশ্য। চতুর্থ হেতু 'পদাৎ' যার অর্থ 'পদ্যতে জ্ঞায়তে অনেন ইতি পদম'। তার আশ্রয় অনুমানটি হল- ঘটাদি সম্প্রদায় স্বতন্ত্র পুরুষ থেকে প্রযোজ্য আধুনিক লিপি শিক্ষাদির সমান, ব্যবহাররূপ হওয়ায়। পঞ্চম হেতু 'প্রত্যয়তঃ' অর্থ হল 'প্রামাণাৎ', বেদজ্ঞান প্রমা হওয়ায় প্রত্যাশাদি প্রমার সমান, কারণ গুণজন্য। ষষ্ঠ হেতু 'শ্রুতেঃ' অর্থাৎ বেদাৎ। এর আশ্রয় অনুমানটি হল- বেদ পৌরুষেয়, কারণ, আয়ুর্বেদের সমান অথবা বেদবাক্য পৌরুষেয়র বাক্য হওয়ায় আমাদের বাক্যের মত। অষ্টম হেতু 'সংখ্যাবিশেষৎ'- এই অনুসারে দ্ব্যণুকের পরিমাণ সংখ্যাজন্য পরিণাম ও প্রচয় থেকে জন্য না হলেও জন্য পরিমাণ। একই সময় পরিমাপের দুটি কপাল থেকে উৎপন্ন ঘটের পরিমাণ থেকে তা প্রকৃষ্ট সেই প্রকারের কপালদ্বয় থেকে উৎপন্ন ঘটের পরিমানের সমান।

অনু পরিমাণ দ্ব্যণুক পরিমা্ণের জনক হয় না। অনু নিত্য পরিমাণ হওয়ায় এই প্রকার সৃষ্টির আদিতে দ্ব্যণুকের পরিমাণের হেতুভূত পরমাণুদ্বয় স্থিত দ্বিত্ব সংখ্যা অস্মাদদির 'অপেক্ষাবুদ্ধি' জন্য নয়। এইজন্য সেই 'অপেক্ষাবুদ্ধি' ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার্য।৩

যোগ দর্শনে সাংখ্য দর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত একটি তত্ত্ব তথা ঈশ্বরকে স্বীকার করেন। যার ফলে যোগ দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলে অভিহিত করা হয়। যোগ দর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বর প্রণিধানকে

সমাধি লাভের অন্যতম উপায়রূপে গণ্য করেন। যোগ সূত্রের সমাধিপাদে উল্লেখ ও নিরুপন করে বলা হয়েছে- ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা (যোগসূত্র ১/২৩) অর্থাৎ সমাধি ও তার ফল লাভের জন্য ঈশ্বর উপাসনা ও ঈশ্বরে সর্ব কর্ম সমার্পণ করা। পতঞ্জলি বর্ণিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভের অন্যতম উপায় অষ্টাঙ্গিক যোগের একটি তথা দ্বিতীয় যোগাঙ্গ হল নিয়ম। ঈশ্বর প্রণিধান নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরচিন্তা সমাধিলাভের সহায়ক হয়। তাছাড়া ঈশ্বরের ধারণাও বিষয় হতে পারে। পতঞ্জলি ঈশ্বরের সেই ব্যাবহারিক প্রয়োজন ছাড়া কোন তাত্ত্বিক প্রয়োজনের কথা বলেননি।

যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরকে পুরুষ বিশেষ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে পতঞ্জলি সমাধিপাদে বলেন "ক্লেশকর্মবিপাকশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর"। (যোগসূত্র ১/২৪) সাধারণ পুরুষের সাথে ঈশ্বরের পার্থক্য এই যে, সাধারণ পুরুষ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ, পাপ ও পুণ্য, কর্মফল বা বিপাক এবং কর্মফল অনুযায়ী সংস্কারের অতীত নয়, কিন্তু ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয় ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। সাধারণ পুরুষ বহু কিন্তু পুরুষ বিশেষ বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। পুরুষ মুক্ত হলেও সাধারণ পুরুষের মতো ক্লেশাদির সাথে সম্পর্ক থাকে না। মুক্ত পুরুষের ক্লেশ প্রভৃতি মুক্তি বা কৈবল্য প্রাপ্তি পূর্বে ছিল, কিন্তু বর্তমানে নেই। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ক্লেশ প্রভৃতি কোন কালেই ছিল না। এজন্য তিনি মুক্ত পুরুষ থেকে সদা মুক্ত। বাচস্পতি মিশ্রের মতে জ্ঞান, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতি সম্পদই ঈশ্বরের স্বরূপ বা ঐশ্বর্য। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য সর্বাপ্রেক্ষা মহৎ। এই ঐশ্বর্য অসাম্য ও নিরতিশয়। এই ঐশ্বর্যের তুল্য অথবা তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য আর কারও থাকতে পারে না। তাই বলা যায়, কাষ্টাপ্রাপ্ত ঐশ্বর্যযুক্ত বিলক্ষণ পুরুষই ঈশ্বর। সুতরাং, ঈশ্বর নামক পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ,বুদ্ধ, ও মুক্ত স্বভাব।৪

যোগ মতে পরম পুরুষ ঈশ্বর কিন্তু জগৎ স্রষ্টা নন। নৈতিক দিক থেকে জীবের অদৃষ্ট রক্ষনাবেক্ষণ এবং অদৃষ্ট অনুযায়ী প্রকৃতি বিবর্তনের জন্য ঈশ্বরকে প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগের নিমিত্ত কারণ বলা হয়। কিন্তু, তিনি স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করেন না। যোগ মতে জগৎ সৃষ্টি ব্রহ্মার কাজ। শ্রুতিতে বলা হয়েছে দেবতাদের মধ্যে হিরণ্য গর্ভ ব্রহ্মা প্রথম উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনিই বিশ্বের কর্তা এবং ভুবনের পালয়িতা। স্মৃতিতে আছে, জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা মুক্ত পুরুষ নন।, পরে তাঁর মুক্তি হয়। নিত্য মুক্ত ঈশ্বরের পক্ষে জগৎ তাই যুক্তি বিরুদ্ধ ও শাত্র বিরোধী। ঈশ্বরের উপদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মা জগৎ সৃষতি করেন। যোগ মতে সৃষ্টিকালে ও কল্পান্তে ব্রহ্মাদি দেবগনের সৃষ্টি ও বিনাশ হয়। কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্টি বিনাশ রহিত। তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নন। তিনি শুধু সাধারণ জীবেরই

গুরু বা উপদেষ্টা নন, পূর্বাপূর্ব সৃষ্টি কর্তাদের কথা গুরুদেরও গুরু বা উপদেষ্টা।

মহর্ষি পতঞ্জলি পৃথকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে কোন প্রমাণ দেননি। ঈশ্বর প্রণিধান প্রসঙ্গেই তিনি ঈশ্বরের লক্ষণ বা পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে যোগসূত্রের সমাধিপাদে তিনি বলেন- 'তত্র নিরতিশয়ঁ সর্বজ্ঞ বীজম্'(যোগসূত্র ১/২৫) অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্বজ্ঞবীজ নিরতিশ্যত্ব প্রপ্ত হয়েছে।৫

পরবর্তীকালে এই সূত্রটিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পরবর্তী যোগ দার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে অনুমান ও আগম প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত, যে জিনিসের মাত্রাভেদ আছে তার একটি উচ্চতম বা চরমতম এবং নিম্নতম বা ন্যূনতম মাত্রা থাকতে বাধ্য। উচ্চতম বা চরমতম মারত্রাকে বলে কাষ্ঠা। জ্ঞান ও শক্তির মাত্রাভেদ আছে। ব্যবহারিক জীবনে কোন জীবের জ্ঞান ও বেশী আবার কম হয়ে থাকে। যেখানেই আমরা অল্প, বহু, বহুতর, বহুতম – এইভাবে ক্রমবর্ধমান কোন গুণকে সাজাই, সেখানেই যুক্তিসঙ্গতভাবে আমাদের একটি নিরতিশয় বা পরাকাষ্টা স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হয়। যোগ দর্শন আস্তিক দর্শন। এই দর্শন বেদ তথা বেদনুসারী শাস্ত্রসমূহে বিশ্বাসী। শ্রুতিকে নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। সুত্রাং বেদ যদি অভ্রান্ত হয়, তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। প্রশ্ন হতে পারে, বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতি যেসব শাস্ত্র ঈশ্বরের রচিত বলে স্বীকার করা হয়, তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কীভাবে প্রমাণ করে? এই উত্তরে যোগ ভাষ্যকার বেদব্যাস বলেন, বেদের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। যদিও ঈশ্বর বেদের রচয়িতা তবু অস্তিওত্বের দিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদের অস্তিত্বের পূর্বে। অতএব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

তৃতীয়ত, প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিমিত্ত কারণরূপেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষের সাথে সংযোগ ভিন্ন প্রকৃতির অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। অচেতন প্রকৃতি ও সচেতন পুরুষের স্বাভাবিক সংযোগ সম্ভব নয়। তাছাড়া জগৎ সৃষ্টি বা প্রকৃতির বিবর্তন জীবের অদৃষ্ট অনুসারেই হয়। জীবের অদৃষ্ট সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ছাড়া কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বর জগতের বিবর্তনের ইচ্ছা করেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ সম্ভব হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যতীত এসব সম্ভব নয় বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার

করতে হয়।

চতুর্থত, সৃষ্টির আদিতে বা অতীতে সৃষ্টিতে যে মোক্ষ জ্ঞান অ মোক্ষাভিলাষ পরিলক্ষিত হয়, সেই জ্ঞানের উন্মেষের জন্য কোন জ্ঞানী গুরু স্বীকার করা প্রয়োজন। কিন্তু এই জ্ঞানের কারণ হিসাবে কোন মানুষ অথবা স্বর্গের কেউ গুরু একথা বলা যায় না। কারণ, যোগ মতে কপিলাদি পূর্বাচার্যগণ এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ কালাবচ্ছিন্ন। কল্পেই তাঁদের আবির্ভাব আবার কল্পান্তেই তাঁদের তিরোভাব হয় বলে শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে। যেহেতু তাঁরা সকলেই সীমিত, সেহেতু তাঁদেরও গুরু ছিলেন-একথা স্বীকার করা প্রয়োজন। ফলে অতীত ও অনাগত সৃষ্টিতে মোক্ষ জ্ঞানের বা প্রকর্ষ গতির হেতুরূপে কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন এওমন একজন গুরু স্বীকার করতে হয়। যিনি অনাদি ও অনন্ত জ্ঞান সম্পন্ন। সেই গুরুই নিত্যমুক্ত ঈশ্বর। এজন্যই যোগসূত্রের সমাধিপাদে বলা হয়েছে-

'স পূর্বৈষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ'। (যোগসূত্র ১/২৬) অর্থাৎ তিনি অনাদি গুরু, যিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ নন।৬

সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী তথা মূলপ্রকৃতি ও পুরুষ এই দুটি মূল বা চরমতত্ত্বের ভিত্তি করে দার্শনিক পরিকাঠামোকে মূল্যায়ন করা হয়। তবে এই দুইয়ের অতিরিক্ত একটি তথা ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যিকতার সংশয় দেখা যায়, যা নিরসন করা বিচারযোগ্য। আমরা সাংখ্য দর্শন সম্পর্কে মূলতঃ শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' মূল গ্রন্থরূপে অনুধাবন করি। তবে বিজ্ঞানভিক্ষু 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' গ্রন্থেটিকে কপিল প্রণীত সূত্রগ্রন্থরূপে বিবেচনা করেন। এই দুটি মূল গ্রন্থ থেকে আমরা সাংখ্য দর্শন সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনাগুলিকে অনুধাবন করি। এই গ্রন্থ পাঠ করে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেটি হল- পদার্থ তত্ত্বকাঠামোর দিক থেকে জগৎ সৃষ্টির জন্য ও মোক্ষ লাভের জন্য ঈশ্বরের আবশ্যিকতাকে গ্রহণ করা যায় কিনা? তার ভিত্তিতে সূত্রকারকে তথা মহর্ষি কপিলকে কি নিরীশ্বরবাদী বলা যায় ?

সাংখ্য মতে সৃষ্টি বলতে অভিব্যক্তি বোঝায়। যা প্রচ্ছন্ন আছে তাই প্রকট হয়, নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না। এ মতে ধ্বংস বলততেও পরিপূর্ণ বিনষ্ট বোঝায় না। ধ্বংস শুধু রূপান্তর বোঝায়। সাংখ্য দর্শনে পুরুষের সান্নিধ্যমাত্র প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়। অচেতন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বিশুদ্ধ হয়ে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, এওকাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রের পরিণাম পঞ্চমাহাভূতরূপে জগৎ সৃষ্টি করে। পুরুষ চেতন অথচ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সুতরাং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি পুরুষের নেই। তথাপি প্রকৃতি, পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সাধনের জন্য জগৎ সৃষ্টি করে। কিন্তু

অচেতন প্রকৃতি এইরূপ সৃষ্টি করতে কেন প্রবৃত্ত হয়, এর উত্তরে সাংখ্যাচার্চাগণ বলেন যে, প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনের প্রবৃত্ত না হলেও অন্যের প্রয়োজনের জন্য প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অন্যের প্রয়োজনের জন্য প্রবৃত্ত হলেও কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ এই ক্ষেত্রে পর প্রয়োজন এবং স্ব-প্রয়োজন সমান। নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ হলে মানুষ যেমন তার প্রযত্ন থেকে বিরত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের মুক্তি সাধন করে বিরত হয় আর সৃষ্টি করে না। সুতরাং প্রকৃতির এই সৃষ্টি পুরুষের জন্য। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা' গ্রন্থে বলেন-

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহাদাদিবিশেষ ভূত পর্যন্তঃ।
প্রতি পুরুষ বিমোক্ষর্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভ।।৫৬।।৭

অতএব, সাংখ্যবর্ণিত বদ্ধ পুরুষের ভোগাদৃষ্ট অনুযায়ী নিজেই সৃষ্টি করে। কারণ সৃষ্টি করাই প্রকৃতির স্বভাব। অতএব, সৃষ্টিকার্যের জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

সাংখ্যাচার্যগণ আবার বলেন যে, যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁরা ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলেন; কিন্তু যা নিত্য ও অপরিণামী তার পরিবর্তন কিরূপে সম্ভব হতে পারে? যদি তার কোন পরিবর্তনই না হয়, যদি সর্বদা একরূপেই বর্তমান থাকেন, তাহলে তার কোন আছে বলে বিশ্বাস করা যায় না এবং যার কোন ক্রিয়াশক্তি প্রতিপন্ন হয় না, তাকে নিমিত্তত কারণ বলা নিরর্থক। সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন যে, মূল কারণটি নিত্য হলেও তা পরিণামী নয়, পরিণামী নিত্যেরই নাম প্রকৃতি।

অনেক দার্শনিক বলেন, এই মত যথাযথ নয়। তার কারণ হল, ঈশ্বরের যখন কোন ক্রিয়া বা ব্যাপার নেই, তখন তিনি প্রকৃতির প্রতিষ্ঠাতা হবেন কি রূপে? ঈশ্বরকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হতে হলে ক্রিয়াযুক্ত হতে হয়; কিন্তু ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বরের কোন ক্রিয়া নেই। আবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ঈশ্বর স্বয়ং পূর্ণ হয়েও প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হতে যাবেন কেন? প্রকৃতির অধিষ্ঠান বিষয়ে তাঁর প্রবৃত্তি হবে কেন? ঈশ্বর যখন স্বয়ং পূর্ণ তখন তাঁর অভাব এবং তজ্জনিত প্রবৃত্তি কল্পনা করা যেতে পারে না। যদি বলা হয় যে, পর দুঃখ পরিহার করার প্রবৃত্তি থেকেই প্রকৃতি অধিষ্ঠাতা হন, তাহলে সে মতও যথাযথ নয়। তার কারণ, সৃষ্টির পুর্বে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন এমন কারা ছিল যাদের দুঃখে তিনি বিচলিত হতে পারতেন? বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্বে দুঃখই ছিল না। তিনি যদি সৃষ্টি কর্তা হয়ে থাকেন, তাহলে দুঃখও তারই সৃষ্টি। জীবের প্রতি করুণাই যদি জগৎ সৃষ্টির কারণ হউয়, তাহলে ঈশর করুণা করে সকল প্রাণীকেই সুখী করতেন; কিন্তু জগতে দুঃখী লোকের অভাব নেই। আর যদি তার

কারুণ্য চরিতার্থ করবার ইচ্ছা থাকত, তবে তিনি অন্য সহজ উপায়েও তা করতে পারতেন। তিনি যদি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা না হতেন, তা হলেও সৃষ্টি হত না এবং দুঃখাদিরও উৎপত্তি হত না।

মোক্ষসাধনের জন্যও ঈশ্বরের কোন আবশ্যিকতা নেই। কারণ যথাযথভাবে সাংখ্যশাস্ত্র অনুশীলনের ফলে বৈরাগ্যের উদয় হলে যোগ উক্ত সেই ক্রিয়া অনুযায়ী যোগাভ্যাস করেই প্রকৃতি পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎজ্ঞান হয়, এবং এরূপ ভেদ সাক্ষাৎজ্ঞান হলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় প্রাবদ্ধ কর্মের ফলভোগের অবসানে দেহপাতের পর পুনরায় জন্ম হয় না। কারণ ভোগজনক সঙ্গস্কার দগ্ধবীজের মত কার্যোৎপাদক শক্তি শূণ্য হয়ে যায়। শরীরাম্ভক কোন প্রকার হেতু না থাকায় পুনরায় জন্ম হতে পারে না অর্থাৎ তখন পুরুষ চিরদিনের মত মুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং সাংখ্য বর্ণিত মোক্ষপ্রপ্তির উপায়ের মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলে তাঁকে পুরুষরূপেই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর মুক্ত বা বদ্ধ কোন পুরুষরূপেই ঈশ্বর স্বীকৃত হতে পারেন না। তিনি যদি বদ্ধ পুরুষ হন, তাহলে তিনিও দুঃখত্রয়ের অধীন হবে, কিন্তু ঈশ্বর কখনও দুঃখের অধীন হতে পারেন না। আবার ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তাহলে তাঁকে নিত্যমুক্ত বলতে হয়। তিনি যদি নিত্যমুক্ত হন, তাহলে জগতের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

প্রাচীন সাংখ্যাচার্যাগণ এই সমস্ত যুক্তির সাহায্যে বাচস্পতি মিশ্র, অনিরুদ্ধ প্রমুখ দার্শনিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী।৮ এই মতে প্রকৃতি স্বভাববশেই জগৎরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হয়। তার এইরূপ স্বভাবের কারণ হল পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদন। গবোৎসের নিমিত্ত যেমন গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণ হয়, তেমনি পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্তই প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই পরিণামের কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তাই এ প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' বলেন- 'ন ব্রহ্মোপাদানঃ চিতিশক্তের পরিমানাৎ। নেশ্বরাধিষ্ঠিত-প্রকৃতি-কৃতঃ'।৯

কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সাংখ্য ঈশ্বরবাদী।১০ তিনি মনে করেন, সাংখ্য প্রবচন সূত্রকার ঈশ্বরের নাস্তিত্বের কথা কোথাও বলেননি। ঈশ্বরের নাস্তিত্বই যদি সূত্রাকারের অভিপ্রেত হত, তাহলে তিনি প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধির কথা না বলে ঈশ্বরের নাস্তিত্বের কথা বলতেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, সূত্রকারের বক্তব্য থেকে একথাই মনে হয় যে, সাংখ্য সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত জগৎ স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বিরোধী। তাই বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন- 'ঈশ্বরে প্রমাণাভাবাৎ ন দোষঃ' অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ

নেই, এইজন্য দোষ হয় না। তাঁর মতে সাংখ্যের ঈশ্বরের অস্বীকৃতি উদ্দেশ্যমূলক।[১১]

বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বর স্বীকার করার পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তির উল্লেখ করেননি। তবে মূলতঃ তিনি দুটি কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার কথা বলেন – প্রথমত, নিরীশ্বরবাদ শাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে, কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্রে প্রশংসিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যখন প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের বিক্ষোভের ফলে বিরূপ পরিণাম হয়, তখন জগৎ সৃষ্টির আরম্ভ হয়। কোন নির্দিষ্ট কারণ না থাকলে প্রলয়কালে সদৃশ পরিণামাত্মিকা প্রকৃতি বিরূপ পরিণাম আরম্ভ করতে পারে না। এইজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বিরূপ পরিণামের আরম্ভক বলা হয়েছে। তিনি বলেন, অদৃষ্টানুযায়ী ভোগসাধনের জন্য প্রকৃতির অভিব্যক্তি প্রবণতা উপস্থিত হয়। তখন প্রকৃতির সাথে পুরুষের একটি বিশেষ সংযোগ সংগঠিত হয় এবং তারই ফলে ক্রিয়াশক্তিহীন চেতন পুরুষ ও ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হয়ে চেতন ব্যক্তির ন্যায়কার্য করে থাকে এবং সেই কার্যই মহৎ তত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং পুরুষ চেতন হলেও নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। পক্ষান্তরে প্রকৃতি ক্রিয়াশীল এবং সগুণ হলেও অচেতন। সুতরাং এই উভয়ের সংযোগ স্বাভাবিক হতে পারে না। কারণ সংযোগের যে সম্বন্ধ দুটি রয়েছে তাদের মধ্যে কোন একটির পক্ষে ঐরূপ সংযোগারম্ভের প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। কারণ, প্রচেষ্টার জন্য ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। সুতরাং অচেতন প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হলেও চেতননিষ্ঠ ইচ্ছা সম্ভব নয় বলেই সংযোগের জন্য কোন প্রচেষ্টা তার পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে পুরুষ চেতন হলেও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলেই তার সংযোগের অনুকূল প্রযত্ন সম্ভব নয়। অথচ, প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এইজন্যই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জীবের ভোগাদৃষ্ট বশতঃ অভিব্যক্তি প্রবণ প্রকৃতির সাথে পুরুষের সংযোগ সাধন করেন।[১২]

পরিশেষে বলা যায় যে, ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে যে সকল উদ্দেশ্যে ঈশ্বরে অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, সেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধি যথাযথ ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থে কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। সাংখ্যকারিকার টীকাকারগণ যথাযথভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করে নিরীশ্বরবাদীত্বই প্রমাণ করেন। বাচস্পতি মিশ্র, অনিরুদ্ধ, শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিক সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বররূপেই গন্য করেন। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু দাবী করেন যে, সাংখ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। তিনি 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' গ্রন্থটিকে কপিল প্রণিত বলেও প্রচার ও দাবী করেন। এই দুই মূল গ্রন্থকে কেন্দ্র করে মহর্ষি কপিলকে নিরীশ্বর বা ঈশ্বরবাদী বলা যাবে কিনা? তা নির্ণয়

করা খুবই কঠিন ও দূরহ ব্যাপার। তার কারণ আমরা মহর্ষি কপিলের মূল গ্রন্থকে পাই না। পরিবর্তে গুরু পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' গ্রন্থকেই প্রাচীন ও মূল গ্রন্থরূপে গন্য করি। এই গ্রন্থের বহু বছর পর বিজ্ঞানভিক্ষু দাবী অনুসারে যে গ্রন্থকে কপিল প্রণীত বলে পাওয়া যায়, তাও সন্দেহের অবকাশ রাখে। এমতাবস্থায় ঈশ্বরকৃষ্ণের ঈশ্বর প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাকেই অনেকেই মেনে নেন যে সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বর ও যোগ দর্শন সেশ্বর। তবে এ বিষয়ে পন্দিত মহলে বিতর্কও দেখা যায় যে সাংখ্য দর্শন ও যোগ দর্শন সমানতন্ত্র হয়েও কীভাবে এরূপ বিভেদ করা যায়?

এরূপ মনে করার কারণ হল যোগ দর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণিত 'পাতঞ্জলসূত্র' গ্রন্থে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। তবে সাংখ্য দর্শনে যে উদ্দেশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, সেই একই উদ্দেশ্যে যোগ দর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। স্যতরাং যাঁরা সাংখ্য ও যোগ দর্শনকে পৃথকরূপে অভিহিত করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে গীতিকার বলেন – সাংখ্যযোগেই পৃথক বলোঃ প্রবদন্তি ন পন্ডিতা', এবং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি'।

তবে প্রাচীন সাংখ্য সম্পর্কে পুরাণাদি প্রভৃতি গ্রন্থে সাংখ্য দর্শন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও তার জয়ধ্বনি পাওয়া যায়। যদিও কোনও গ্রন্থের ভূমিকাতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লক্ষ্য করে এবং তার ভিত্তিতে বলা যায় যে সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেখানে কেন ঈশ্বর স্বীকার করেছেন? যদিও ধরে নেওয়া যায় যে, ঈশ্বরে অস্তিত্বে বিশ্বাস কপ্রেন তা কি পুরুষ অতিরিক্ত নাকি পুরুষ বিশেষ ? এ বিষয়ে তথা "আদি সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরে স্বীকৃত হত, পরে বৌদ্ধযুগের প্রভাবে তাকে নিরীশ্বরবাদীরূপে প্রচার করা হয়েছে। এই অভিমত বাল গঙ্গাধর তিলকের গবেষণার পর উপেক্ষা করা যায় না। কারণ সাংখ্যকারিকাভাষ্যদৃষ্টে তিনি বর্তমানে অনুদ্ধৃত ৬২তম যে কারিকাটি আবিষ্কার করেছেন তাতে ঈশ্বরের ইঙ্গিত আছে।"

তথ্যসূত্র

১। উদয়ানাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ডঃ চন্দন ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক), কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৪,

২। প্রশস্তপাদ, প্রশস্তপাদভাষ্যম্, দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামদরাশ্রম, ২০১০

৩। উদয়ানাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ডঃ চন্দন ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক), কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৪,

৪। বেদান্তচঞ্চু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৭,

৫। আরণ্যক, শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ, পাতঞ্জল যোগ দর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫

৬। ঐ

৭। অজ্ঞাত লেখক, যুক্তিদীপিকা, শ্রী যদুপতি ত্রিপাঠি (অনুবাদক), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১১

৮। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬০

৮। গৌড়পাদ, গৌড়পাদভাষ্য, শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদক), কলকাতা, স্বদেশ, ১৪১৫ (ভূমিকা)

৯। বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (অনুবাদক), কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৮

১০। গৌড়পাদ, গৌড়পাদভাষ্য, শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদক), কলকাতা, স্বদেশ, ১৪১৫ (ভূমিকা)

১১। মহর্ষি কপিল, সাংখ্যদর্শনম্, কালীবর বেদান্তবাগীশ, কলকাতা, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৬০

১২। ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, সাংখ্য দর্শনের বিবরণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৮

আধুনিক যুগে পুরুষার্থ

অনিমেশ সরকার

সারসংক্ষেপ :

প্রাচ্য ও প্রাশ্চ্যাত্য উভয় নীতিতত্বের ক্ষেত্রেই নৈতিকতার (morality) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নৈতিকতার যে ধারণাটি গড়ে ওঠেছে তার একটি মূলস্তম্ভ হল পুরুষার্থের ধারণা। এই পুরুষার্থই ভারতীয় নীতিবিদ্যার একটি দিক নির্দেশক। সুতরাং দাবি করা সঙ্গত যে ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে পুরুষার্থের ধারণাটি স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। পুরুষার্থ মানুষের জীবনের পরিচালনার জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করে। পুরুষার্থ মানুষের সাধনার প্রতিফলন। বৈদিক যুগের (রামায়ণ, মহাভারত)সময় পুরুষার্থ মানুষের জীবনে সর্বাঙ্গীন ভাবে প্রয়োগ করা হত কিন্তু যুগের পরিবর্তন হয়েছে সাথে সাথে মানুষেরও পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল যুগে পুরুষার্থের প্রাসঙ্গিকতা কি আদৌ আছে? আমার এই প্রবন্ধে এটাই অন্বেষণ করার চেষ্টা করব যে বৈদিক যুগের পুরুষার্থ কিভাবে আধুনিক যুগেও সমান ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

বীজশব্দ: পুরুষ, অর্থ, কাম্যবস্তু, সাধনা, অর্জিত, পরম আনন্দ, মূল্যবান। 'পুরুষার্থ'[১] শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি শব্দ পাওয়া যায়। একটি হল 'পুরুষ ' অন্যটি হল 'অর্থ'। পুরুষ বলতে "সচেতন মানবকে বোঝানো হয়েছে " এবং অর্থ বলতে বোঝানো হয়েছে " মানুষ যা কামনা করে বা কাম্যবস্তু "। ফলতঃ এরূপ বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষার্থের অর্থ হল " সচেতন মানুষের কাম্যবস্তু"[২] । স্বাভাবিকভাবেই পুরুষার্থের ধারণার সঙ্গে কাম্যবস্তুর ধারণাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখন প্রশ্ন হল : কাম্যবস্তু কি? প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কাম্যবস্তু হল এমন বস্তু যা মানুষ কামনা করে। কামনা করে এই কারনে যে তা মানুষের মধ্যে অনুপস্থিত, কিন্তু সাধনার বা চেষ্টার মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। অর্জিত হলে মানুষ পরম আনন্দ অনুভব করে। কামনার বস্তু এতই মূল্যবান এ কারণে যে, তা মানুষের চরিত্রকে এক অতি উচ্চ আদর্শের আলোকে আলোকিত করে। তাই ভারতীয় দর্শনে সাধনালব্ধ কাম্যবস্তুর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে পুরুষার্থ চার প্রকার। যথা - ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অবশ্য পুরুষার্থের সংখ্যা নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। অনেকে

মতে আদিতে ধর্ম, অর্থ, ও কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তী কালে চতুর্থ পুরুষার্থ 'মোক্ষ' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চারটি পুরুষার্থকে চতুর্বর্গ বলা হয়। এখন এই চারটি পুরুষার্থের অর্থ ও তাৎপর্য পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাক :

ধর্ম :

'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন ' প্রত্যয় যোগ করে 'ধর্ম ' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। "ধৃ+মন = ধর্ম"৩। ' ধর্ম' শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ হল ''ধারণাৎ ধর্মম ইত্যাহু:"৪ - অর্থাৎ ধর্ম তাই যা মানুষ ও সমাজ কে ধারণ বা রক্ষা করে। বেদ উপনিষদে ধর্মকে এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম রূপে গণ্য করা হয়েছে, যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিচালিত হয় এবং জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। ঋকবেদে ' ঋত ' কে ধর্ম বলা হয়েছে। ঋত জীবজগৎ ও জড়জগৎকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। জগতের প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব নিয়মে, তার স্বভাব-নিয়মে চলে এবং সেটাই তার ধর্ম। আগুনের স্বভাব উত্তাপ বিকিরণ করা এবং সেটাই তার ধর্ম।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে সমাজজীবনের প্রেক্ষিতে 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে, লৌকিক অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়নি। লৌকিক অর্থে 'ধর্ম' বলতে বোঝায় ঈশ্বর আরাধনা। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ হল - শাস্ত্রসম্মত সামাজিক আচরণবিধি যা প্রত্যেক মানুষের তার 'বর্ণ' ও 'আশ্রম ' অনুসারে অনুসরণীয়। সমাজে বসবাস করে নিজের এবং অপরের কল্যানের জন্য মানুষকে যে সব আচারণবিধি অনুসরণ করতে হয়, সেটাই তার ধর্ম। ব্যক্তি তথা সমাজ তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য কর্মসাধনই মানুষের ধর্ম। আসলে আধুনিক পরিভাষায় যাকে Justice বা ন্যায়ধর্ম বলা হয় তাকেই ভারতীয় দর্শনে ধর্ম বলা হয়। গীতায় তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষাত্র ধর্ম পালন করে যুদ্ধে (কর্মে) অগ্রসর হতে বলেছেন এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

অর্থঃ

অর্থ হল চতুর্বিধ পুরুষার্থের অন্যতম। কারন ধর্মাচারণের জন্য অর্থেরও একান্ত প্রয়োজন। অর্থ ছাড়া ধর্মাচারণ সম্ভব নয় বলেই অর্থকেও পুরুষার্থ রূপে গণ্য করা হয়। চাণক্য বলেছেন- " ধর্মস্য মূলম অর্থঃ " - অর্থাৎ অর্থই হল ধর্মেই মূল বা ভিত্তি। আশ্রম ধর্ম পালনের জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়। বেদবিহিত বিভিন্ন প্রকার ধর্মানুষ্টানের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন। গার্হস্থ্য জীবন যাপনের জন্যও অর্থের প্রয়োজন। অর্থ তাই মানব জীবনের অন্যতম পুরুষার্থ। ক্ষত্রিয় অর্জুন মহাভারতের শান্তি পর্বে উদাসীন যুধিষ্ঠিরকে অর্থের মাহাত্ম্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাঁর মতে " ধর্ম, কাম, স্বর্গ, আনন্দ, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়দমন - এই সমস্ত কিছুই অর্থের দ্বারা নিস্পন্ন হয়। পর্বত থেকে যেমন অনেক নদী ধারা বেরিয়ে আসে তেমনি নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা, ক্রমে বেড়ে ওঠা সঞ্চিত অর্থ থেকেই সমস্ত কাজ করা যায়। এই অর্থ থেকেই ধর্ম, কাম, স্বর্গ এবং এই অর্থ থেকেই জীবনযাত্রার কাজ নির্ধারিত হয়" ৫।

তবে অর্থ কাম্য বস্তু হলেও সৎ উপায়ে তা উপার্জন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল: কিভাবে এই অর্থ লাভ করা যায়? উত্তরে বলা হয়, অর্থ বলতে এমন কোনো সম্পদকে বোঝানো হয় না যা অন্যায়ভাবে সংগৃহিত। চৌর্যবৃত্তির দ্বারা সংগৃহিত অর্থ অসদুপায়ে বা শোষণের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ কখনোই পুরুষার্থ নয়। তার কারণ এই যে, অর্থ পুরুষার্থ হলেও যে অর্থ অনৈতিক পথে সঞ্চিত তা পুরুষার্থ নয়। অসদুপায়ে সংগৃহিত অর্থকে এই কারণে " অর্থ দূষণ"৬ বলা হয়েছে। সুতরাং ন্যায়সম্মত পথে অর্থ উপার্জন করে তা নিজের ও অপরাপর বহুজনের কল্যাণ সাধনে নিয়োগ করলে তবেই সেই অর্থকে 'পুরুষার্থ ' বলা হবে।

কাম :

কাম হল তৃতীয় পুরুষার্থ। ' কাম ' শব্দের সাধারণ অর্থ হল ' যৌন সুখ সম্ভোগের ইচ্ছা '। কিন্তু শুধুমাত্র যৌন সম্ভোগের ইচ্ছাকেই কাম বলে না। এটি তার সংকীর্ণ অর্থ। ব্যাপকতম অর্থে যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগই কাম রূপে অভিহিত। হিন্দু চিন্তাধারা অনুসারে, কাম মানে একক যৌন জীবন নয়। এর অর্থ আবেগময় এবং নান্দনিক জীবনও। হিন্দু চিন্তাবিদদের আরেকটি বিশ্বাস হচ্ছে, মৌলিক কামনা চরিতার্থ করা আবশ্যক, তাদের দমন পরিণামে পরিত্রাণ অর্জনে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের জন্য যৌনতার সন্তুষ্টির অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন। কাম মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জীবনের বিকাশের জন্য নির্ধারিত।

মানুষের মধ্যে দুটি প্রবৃত্তি নিহিত, জীববৃত্তি বা পশুবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি। পশুবৃত্তি বা জীববৃত্তির জন্য মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নিম্নতর জৈবিক সত্তা যা বিভিন্ন প্রকার দৈহিক সুখকে পাবার লালসায় উন্মত্ত। কিন্তু মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিরও উপস্থিতি থাকায় মানুষ শুধুমাত্র যৌন সম্ভোগ রূপ কামকে সবসময় কামনা করে না। এই বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মানুষ কামকে সংযত ভাবে চালিত করে এবং মানুষকে লক্ষণাভিমুখী করে তোলে। তাই ভারতীয় দর্শনে কামের জন্য কামাচারণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। সুতরাং অসংযত ও অমিতাচার কাম পুরুষার্থ নয়, নীতিসম্মত ও শাস্ত্রবিহিত কামই পুরুষার্থ।

মোক্ষ:

ভারতীয় দর্শনে চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। মোক্ষ বলতে দুঃখ, মৃত্যু, পুনঃজর্ন্মের চক্র (সংসার) থেকে প্রকৃত জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তিকে বোঝায়। মোক্ষ হল অজ্ঞতা থেকে মুক্তি। হিন্দু ধর্ম ঐতিহ্যে মোক্ষ হল একটি কেন্দ্রীয় মতবাদ এবং মানব জীবনের চারটি পুরুষার্থের মাঝে মোক্ষ হল চুড়ান্ত লক্ষ্য। অপরাপর পুরুষার্থগুলি হল এর সহযোগী মাত্র। এই জন্য ধর্ম, অর্থ ,কাম এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থকে পরতঃপুরুষার্থ বলা হয়। মোক্ষই কেবল স্বতঃমূল্যবান। মোক্ষ হল নিত্য পুরুষার্থ, যেটা ব্যক্তি অর্জন করলে আর চাওয়ার কিছু থাকে না।

অবশ্য মোক্ষ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির জীবন অবশ্যই ধর্ম ভিত্তিক হবে এবং ধর্মের ভিত্তিতেই অর্থ ও কামকে স্থাপন করবেন। ভারতীয় দর্শন এটাই প্রতিপাদন করতে চায় যে আমাদের জীবন হল মূলতঃ অধ্যাত্মমুখী। অধ্যাত্মবোধই আমাদের জীবনের চরম বৈশিষ্ট্য। আমাদের দৈনন্দিন ও ঐহিক জীবন তাই অধ্যাত্ম পথের সোপানমাত্র - যার মাধ্যমে আমরা পরম পুরুষার্থ লাভ করতে পারি।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বৈদিক যুগে পুরুষার্থ মানব জীবনে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল বর্তমান সময়েও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। আধুনিক যুগে এই পুরুষার্থ গুলিকে জানা এবং বোঝা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। নিরন্তর বিভ্রান্তি এবং বিরক্তির এই সময়ে শান্তি এবং প্রশান্তি প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ দিশেহারা ও মানবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যার ফলে মানুষ অমানবিক ও অনৈতিকতার অনুশীলন করছে। এটি কেবল ব্যক্তি নয় সমাজকেও প্রভাবিত করে। সুতরাং পুরুষার্থ সম্পর্কে যাদের প্রকৃত উপলব্ধি রয়েছে তারা তাদের জড়তা থেকে মুক্তি পাবে এবং অন্যদের দ্বারা পরিচালিত হবে না। অতএব প্রগতিশীল, উন্নত ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ে তুলতে হয় তাহলে পুরুষার্থকে সকলের দ্বারা সামগ্রিক ভাবে অনুসরণ করা দরকার। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এই শিক্ষাগুলি দিতে হবে যে, সামগ্রিক ভাবে স্বাথ্যকর উপায়ে জীবনযাপনের জন্য পুরুষার্থ কতটা অপরিহার্য ও গ্রহণযোগ্য।

তথ্যসূত্র:

১। ডঃ বিমলেন্দু সামন্ত, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নীতিতত্ব, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৩।

২। তদেব।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা -৬।

৪। ডঃ দীক্ষিত গুপ্ত, নীতিবিদ্যা, ২০১৩ পৃষ্ঠা ৬।

৫। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী , দন্ডনীতি।

৬। দীক্ষিত গুপ্ত , নীতিবিদ্যা , ২০১৩ , পৃষ্ঠা ১৯।

গ্রন্থপঞ্জি

১। ডঃ দীক্ষিত গুপ্ত, নীতিবিদ্যা, শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটারস, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, ২০১৩।

২। ডঃ বিমলেন্দু সামন্ত, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নীতিতত্ব, আরামবাগ বুক হাউস, ২২/। এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ২০০৫।

৩। নিরদবরণ চক্রবর্তী, ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা।

৪। দীপক কুমার বাগচী, ভারতীয় নীতিবিদ্যা, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ২০১১।

৫। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯।

৬। শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য, পূর্বমীমাংসা দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩।

৭ । ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১।

Embracing Diversity: Unveiling the Intersex Community in Ancient Indian Mythology

Balaka Halder

Abstract:

This study examines the intersex community, which has historically been marginalised and neglected within the framework of Indian mythology. Specifically, it studies references in prominent texts such as the Ramayana, Mahabharata, and other mythological narratives. The intersex community, which encompasses people who have biological variations that challenge the traditional binary understanding of male and female, possesses a rich historical background and exhibits a wide range of representations within ancient Indian scriptures. This paper aims to illuminate the extensive historical acknowledgement of intersex individuals by comprehensively analysing these narratives. This study examines the myths and narratives surrounding intersex individuals, including figures such as Srikhandi, Aruna, and Bahuchara. It emphasises the importance of these stories in influencing societal norms and perspectives. These narratives serve to highlight not only the malleability of gender identities but also to expose the intricate interconnections between social, cultural, and medical circumstances. Moreover, this paper examines the obstacles encountered by the intersex community in present-day society, highlighting the imperative for comprehensive policies and societal embrace. This analysis examines the societal marginalisation and stigmatisation experienced by intersex individuals, highlighting the similarities between historical narratives and contemporary forms of discrimination. This paper argues for the inclusion and acceptance of the intersex community within mainstream society, emphasising the importance of examining mythological narratives and their relationship to contemporary societal

dynamics. The paper aims to dismantle harmful stereotypes and promote inclusivity by juxtaposing these narratives. In essence, this highlights the significance of embracing diversity and equality as fundamental principles in safeguarding the welfare and rights of humans irrespective of their gender identity.

Introduction:

The intersex community is a distinct subset of human existence that is frequently misunderstood despite the richness and variety of the human experience. Intersex people are born with biological variances in their sex traits, challenging the binary definition of male and female. Intersex people have been around since ancient times. Consequently, people frequently confront major obstacles when navigating social, cultural, and medical environments, severely affecting their health and legal rights.

For a long time, members of Indian society denied the existence of the third gender and stereotyped those who identified with that gender. In contrast to the depictions of the third gender found in the mythologies of other civilisations, the third gender is given a considerably more prominent role in Indian mythology. A representation of gender that goes beyond the conventional male and female dichotomy is found in the ancient Indian scriptures of the Ramayana and the Mahabharata, considered two of the most famous epic ever.

Before delving into the subject matter, it is essential to acknowledge the substantial distinction that exists between those who identify as "Transgender" or "Transsexual" and those who identify as "Intersex." It is essential to acknowledge that our society possesses a nuanced understanding of the concept of "Hijra". It is important to note that "Hijra" does not refer to a specific gender identity but rather denotes a professional occupation. People who do not wish to conform to the gender binary can enrol in the abovementioned

profession. Similar to various distinct professions, this particular occupation also encompasses a set of norms and protocols that facilitate the registration process for individuals. However, discussing the subject matter does not align with my intended focus. I would like to highlight that while it is commonly advocated for the transsexual, transgender, and intersex communities to be encompassed within a unified term, namely "hijra," it is essential to acknowledge the significant distinctions among these identities. In brief, those who are intersex are characterised by ambiguous genitalia at birth, resulting from distinct medical variations where due to anatomical anomalies called panel agencies, the penis can not grow at the embryonic stage; thus, their sex remains ambiguous. The previous terminology for this particular medical condition is "hermaphrodite". In the Book IV of his magnum opus Metamorphosis, Ovid refers to Hermaphodiots who possess masculine qualities like his father, Hermes and feminine qualities like his mother, Aphrodite. One day while bathing, the nymph Salmacis was spying on him and fell in love with him. She prayed to God to unite them, and God took it literally and united Salmacis's body with Hermaphrodiots. This condition, the amalgamation of the male and female body, has been medically termed a "hermaphrodite" for several years. It is worth noting that a considerable segment of the Indian populace, specifically around 490,000 individuals, displays sexual ambiguity upon birth. To protect themselves and their offspring from potential stigmatisation within society, the parents have concealed the child's sexual orientation. Without obtaining informed consent, the child has undergone multiple corrective surgeries for their ambiguous physical characteristics. Several children have been forsaken by their guardians and compelled to dwell in public spaces due to their prevailing conditions. Despite being abandoned by society, these children received recognition from the Hijra community. They incorporate them

into their community, giving them a sense of belonging and establishing it as their residence. They commenced inhabiting a diminutive community wherein their presence would perpetually evade inspection. The occurrence of discrimination should be prevented. The presence of the intersex community has been evident throughout human history, despite societal tendencies to overlook or dismiss their existence. The Indian myths and oral tales have been substantiated to predate the inception of life. This research paper aims to explore the representation of the Intersex community within Indian mythologies.

Depiction of Intersex Community in Indian Mythologies and Oral Tales:

Balmiki's Ramayana is widely regarded as an extraordinary epic with numerous interpretations. Considerable research has been conducted on representing the Intersex Community in Valmiki's Ramayana, owing to distinct factors. The "Oral Tradition of Hijra Tale" presented when Purushatam Ram departs from Ayodhya for fourteen years to honour his father's commitment to his stepmother, the departure of Ram, a highly revered, benevolent, and influential monarch, evoked a sense of grief and sorrow among the populace. The inhabitants of Ayodha possess no expectations for a monarch other than the revered and virtuous Ram, who upholds the principles of righteousness. The inhabitants of this locality expressed their reluctance to reside in a region where their monarch was not received with hospitality. An attempt was made to depart the country alongside Ram. Upon observing the collective adherence of Ayodhya's populace to Ram during his exile, it appeared that the city would be devoid of inhabitants, thereby lacking a governing authority. Upon witnessing this, Ram became concerned and issued a command, stating, " Men and women of Ayodhya, if you truly love me, return to my brother's kingdom."

Consequently, those who identified as "men" and "wom-

en" ceased to pursue him. However, he failed to acknowledge the existence of the "third gender" or the Intersex community. The individuals affiliated with the Intersex community patiently remained on the river bank for fourteen years, eagerly anticipating the return of their leader. Upon Lord Ram's triumphant return from his decisive victory over Ravan, he encounters a group of people identifying as non-binary who have gathered at the location, eagerly anticipating his arrival. When queried about their decision to remain, they indicated that while their Lord had explicitly instructed both genders not to accompany him, no specific mention was made regarding those identifying as non-binary. Consequently, they elected to remain in that location. Lord Ram expressed great admiration, blessed them, and entered Ayodha alongside them. He promised them that hijras would possess political power in Kali Yuga and also promised them Moksha, which is free from rebirth.

The term trittiya prakriti was fast used in Mahabharata. The Mahabharata contains a narrative involving Amba, who experiences humiliation at the hands of Bishma. In response, she expresses her intention to seek retribution and self-immolate. Amba underwent a process of reincarnation and was born as the daughter of Drupada. However, Drupada expressed his desire for a "son" from Lord Shiva. Shiva assured that his wish would be granted, resulting in Srikhandi's sexual orientation remaining uncertain. However, due to the lack of acceptance of sexual ambiguity in this modern society, Srikhandini was raised as Srikhandi in Drupada's house. Inevitably, the truth cannot remain concealed indefinitely. Eventually, when the kingdom needed an heir to the throne, the king faced mounting pressure to arrange matrimonial alliances for his supposed "son." Despite being aware of the truth, the king found himself compelled to address the demands of his subjects, leading him to enter into matrimony with the daughter of King Hiranyvarna of

Darsana. However, during the nuptial evening, Srikhandi encountered difficulties in consummating their marital union, leading their spouse to seek solace with her father in astonishment. Upon learning of these events, King Hiranyvarna experienced a profound sense of betrayal, prompting him to assemble a military force to launch an invasion of the region of Panchala. Srikhandi, assuming full responsibility for all circumstances, ventured into the forest with the intention of self-harm. However, their attempt was thwarted by the intervention of a Yaksha Sthuna. Did he save a woman or a man? The female individual in question possessed a mindset and demeanour akin to that of a male and consistently received treatment and regard as such. However, her physical body did not align with the male gender. Upon being informed of the narrative of Srikhandi, Sthuna graciously offered his assistance by providing his masculinity, enabling Srikhandi to successfully consummate his marital union with his spouse. Kubera, the sovereign ruler of the Yaksha, exhibited profound anger upon receiving this information. However, upon Srikhandi's return to the bestowed manhood, Kubera was greatly impressed by her unwavering integrity. As a result, he bestowed upon Srikhandi a blessing that granted her the privilege of utilising the manhood of Yaksha for the duration of her lifetime. Yaksha regained his masculinity after the demise of Srikhandi. The notion that conforming to a binary framework is a fundamental requirement for societal integration has been explicitly emphasised. Surgical intervention, known as the transplantation of the yaksha's manhood, is a procedure that intersex people must undergo to align their sexual orientation with societal norms.

In the epic Mahabharata, it is widely recognised that Srikhandini possesses an intersex identity. However, it is essential to recall that during their exile from their native Indraprastha, the Pandavas sought refuge in the court of King Virata, assuming covert identities. Arjun's portrayal

involved the utilisation of female attire to take the appearance of a woman. At the same time, in certain instances, it has been suggested that he transformed to embody a female identity. However, Devdutt Pattanaik presents a different perspective in his literary works Srkhandini and The Other Tales They do not Tell You. The narrative titled " Arjun, Who was temporarily Castrated for Showing Restrain" asserts that Arjuna did not engage in transformation or cross-dressing while assuming his disguise but instead chose to adopt the identity of a eunuch. The narrative alluded to pertains to a subsequent addition within the Mahabharata, wherein Urvashi, the Apsara of the heavens, descends to the terrestrial realm to derive gratification from the mortal men when she experiences ennui. In this instance, the Kuru Clan's Pururava developed romantic feelings for her. After undergoing complete satisfaction, Urvashi decided to terminate her relationship with him, resulting in his mental instability. After the passage of a century, Urvashi encountered a person who bore a striking resemblance to Pururava, thereby evoking memories of their past encounter. The woman moved near the young man and initiated an interaction; however, he rebuffed her advances and proceeded to depart an unprecedented occurrence. When Urvashi inquired about the rationale behind his conduct, the young man identified himself as Arjun, a progeny of Pururava. He explained that due to their prior spousal relationship, she held a maternal role in his life, rendering him unable to respond to her entreaties. In addition, she assumes the role of her father, Indra's mistress, precluding any possibility of indulgence between them. Upon receiving this information, Urvashi became enraged and asserted that she did not belong to anyone. She cursed him, stating, "Only a eunuch rejects a woman who is willing, therefore may you become one." Arjun expressed concern and sought counsel from Indra, who asserted that curses are irrevocable but can be subject to modification. Indra claimed

that Arjun could willingly forfeit his masculinity. The curse inflicted upon Urvashi did not involve a mere transformation into a woman; rather, it entailed the loss of his masculine attributes or the manifestation of intersex characteristics, resulting in the condition commonly referred to as the state of being Intesex. Arjun assumed the identity of a persona named Brihanalla or Birhanada, who identified as intersex during his living incognito. This narrative highlights the imperative of collective survival during periods of adversity. In the event of an assault by an unidentified superior entity, it is imperative that we, as a collective of individuals, unite to safeguard our well-being as members of the human race. The fragmentation based on gender nomenclature may compromise our ability to safeguard ourselves against unidentified adversaries effectively.

Inside the frame of the "Oral Tradition of Hijra," another narrative featuring Bahuchara, the deity who assumed a human form as a woman and entered the mortal realm, married an ordinary man. She anxiously anticipated her husband's arrival each evening, yet he never reappeared in her presence. Everyone in the vicinity commenced attributing fault to her for lacking sufficient physical appeal to maintain her marital relationship. The woman experienced significant distress upon learning this information, prompting her to contemplate observing her husband's activities one evening. Subsequently, she discovered that her husband was engaging in behaviour reminiscent of that exhibited by hijras. She asked her spouse whether he possessed similar characteristics and what motivated him to enter into matrimony with her, thereby causing detriment to her existence. The husband expressed his reluctance towards the marriage, citing familial pressure as the primary reason for his compliance with the alliance to conform to the expectations imposed by his family and society. To achieve this, he must enter into a marital union with a female and subsequently

engage in procreation to become a father. Upon hearing this, the young woman transformed, assuming the divine form of a Goddess. She invoked a curse, decreeing that people of the male gender, similar to the individual above, would adopt the attire traditionally associated with the female gender and engage in the act of venerating her. Although the circumstances under which Bahuchara encountered her husband are not explicitly mentioned, it is indicated that her husband either lacked genitalia or had malformed genitalia, a condition known as Aphalia or intersexuality. This narrative portrays and critiques the societal conventions that restrict personal autonomy and compel individuals to adhere to a controlled social order. These people exhibit a profound lack of knowledge and awareness regarding the detrimental consequences of their oppressive behaviour, resulting in the severe detriment of countless lives.

The Purana Encyclopaedia, authored by Vettam Mani, contains a narrative about Aruna, the deity associated with the arrival of dawn. It has been noted that Vinata and Kashyapa, the progenitors of Aruna, produced eggs. The eggs remained unhatched for an extended duration, and due to impatience, Vitana forcibly broke the egg, resulting in the incomplete or ambiguous development of the child's lower form. Vitana portrayed the deity Aruna, associated with the dawn phenomenon, as an intersex individual. It can be comprehended that the deity responsible for dispelling darkness and illuminating humanity is not characterised by a specific gender, but rather identifies as a member of the Intersex community. However, there is a mention of the necessity to undergo a gender transformation to appeal to Indra and the Sun God and subsequently conceive their offspring. This narrative reflects the lived experiences of intersex individuals who undergo multiple surgical interventions throughout their lives to conform to societal norms surrounding binary male and female categorisations.

In the Shaiva Agamas tale of Hara Gauri, it is related that Nandi once questioned Shiva about his decision to become an Ardhanari. Shiva responded by telling Nandi three stories. Among those, I would be sharing one. The plot follows Bramha, who is known as the Creator. Bramha sprang from the primordial lotus when it flowered, but he soon realised that he was all alone in the world and yearned to bring more beings into existence. His ideas were his sons, who were adamantly opposed of having children. During this time, he had a vision of a person whose left side was a woman's body and whose right flank was a male's body. Using this vision as a guide, he proceeded to make the female equivalents of their sons, and as a result, the earth became populated with living people. According to the legend, a contentious issue surfaced at the beginning of time before human life was even created, and that was the existence of Hara Gauri. Hara Gauri is a beautiful amalgamation of nature and mind, symbolically representing the intersex community. This community served as the inspiration for the creation of living beings. Consequently, this issue sparked a great deal of debate.

In addition to being prominently featured in our mythological texts, the intersex community has historically been marginalised and excluded from societal recognition. The term "hijra" continues to be employed in a derogatory manner. It has been convincingly argued that the outcome of the Mahabharata war would have been different had Mahapitamaha Bishma not voluntarily relinquished his weapon. Bhisma made a solemn vow to abstain from employing any weaponry in the presence of a woman. Pandav was cognizant of the strategic necessity of introducing a female presence in the Kurukshetra to compel Bhishma to relinquish his armament. However, another issue pertains to the exclusion of women from participating in warfare. In a state of uncertainty, Krishna intervened to assist them and instructed them to summon Srikhandi to Kurukshetra, a being who pos-

sessed neither male nor female qualities. The conflict was engaged by employing Srikhandi as a tactical measure, serving as an armoury for Arjun, widely regarded as the most formidable warrior in history. This narrative illustrates how the patriarchy or purportedly civilised society employed and controlled individuals to engage in a significant conflict, ultimately emerging victorious. The achievement was unimaginable in the absence of those individuals. When the moment arrived to integrate them into society, it became apparent that society had abandoned, subjugated, stereotyped, and segregated them.

In this world, individuals have the right to live according to their preferences as long as their actions do not cause harm to others. The latest data reveals that many children in this country, specifically 1.5% of the world population, are born with gender ambiguity. They are still not regarded as an integral part of mainstream society. Inclusivity is a fundamental aspect of our society. In 2020, the National Education Police addressed including children with special needs in regular academic programmes. The absence of any reference to including the Intersex community, representing a form of physical disparity, is notable. Indian society often confuses transmen, transwomen, and intersex individuals, grouping them under the " Other Gender". If society sincerely believes in their most esteemed literary works, such as the Puranas, Mahabharata, and Ramayana, it becomes untenable for them to refute the existence of the intersex community. Rather than subjecting them to ridicule, society should integrate them into the societal mainstream, devoid of any associated stigma. I would like to conclude this paper by incorporating a quote from the esteemed philosopher and spiritual leader Swami Vivekananda. I am optimistic about the prospect of achieving freedom through the attainment of equality in the future.

Bibliography:

Valmiki's Ramayana. Rowman & Littlefield, 2018.

Goldman, Robert P., et al., eds. The Ramayana of Valmiki: An Epic of Ancient India-Kiskindhakanda. Vol.

4. Princeton University Press, 1984.

Buck, William. Mahabharata. University of California Press, 2019.

Orton, Jane. "Shikhandi and Other Tales They Don't Tell You by Devdutt Pattanaik." Marvels & Tales 30.2 (2016): 362-364.

A review on Presage Biology: role of indigenous folk cultures

Sujata Roy Moulik & Sumit Chakraborty

Abstract

Climate change is one of the highest discussed issues in the scientific world. So many strategies are being developed to cope up with it. Numerous policies and discussions are in action globally to counter this challenging issue. But only the big budget strategies with huge scientific instrumentation to monitor and mitigate these challenges are effective- this may not be the fact. Here we have focused on some very ancient, undocumented, indigenous methods, based on folk cultures from which we can get some worthy, cost-effective, simple but crucial methods of forecasting natural calamities. Not only prediction, these methods can render some means to get precautions and disaster management as well. These methods were strongly based on observation of nature and exploring natural resources around us. The lack of proper documentation and awareness is the cause behind our ignorance and thus negligence for such folk methods. The fast and immense changes progressing globally due to innumerable reasons may results in obvious changes to these tribal and indigenous folks, some may be abolished completely even. So, there is an urgent need to explore them, document them, preserve the cultures along with these people and their hidden knowledge by presenting available database about these methods and to make people aware of these. Science may not be far from these indigenous methods if both can be integrated and synchronized. In this study we have discussed on some of these tribal indigenous mitigations, their prediction methodologies and tried to justify these observations from scientific point of view towards the mitigation of this sensitive issue by adaptation of these indigenous folks along

with the existing methodologies.

Key words: Climate change, weather forecast, cultural heritage, nature observation, ethology, traditional knowledge

Introduction

Indigenous or traditional knowledge refers to the knowledge and know-how accumulated across generations, renewed by each new generation, that may guide human societies in their innumerable interactions with their surrounding environment. indigenous knowledge has been widely recognized in fields such as agro-forestry, traditional medicine, biodiversity conservation, applied anthropology, customary resource management, and natural disaster preparedness. The indigenous observations and interpretations of meteorological phenomena have guided seasonal and inter-annual activities of local communities for millennia. This knowledge contributes to climate science by offering observations and interpretations at a much finer spatial scale with considerable temporal depth and by highlighting elements that may be underestimated by climate scientists. Indigenous knowledge mainly focuses on elements of significance for local livelihoods, security and well-being. So, this is essential for climate change adaptation. Indigenous peoples and marginalized populations are particularly exposed and very much sensitive to climate change impacts due to their resource-based livelihoods and the location of their homelands in marginal environments (Nakashima et al., 2012).

Generally, elderly people formulate hypothesis about seasonal changes by observing natural phenomena while cultural and ritual specialists draw predictions from divination, dreams or visions. The most widely relied upon indicators for predicting climate change are the timing, intensity and duration of low temperatures and wind characteristics. Other forecasting indicators include the timing of fruiting by certain local trees, water levels in streams and ponds, insect and nesting behaviour of small birds in the environment etc.

Systematic documentation and subsequent integration of Indigenous Knowledge (IK) in seasonal forecasting is one of the promising initiatives that needs to be explored. Historically and to date, traditional local communities in different parts of the world have continued to rely on IK to conserve the environment and deal with natural disasters. Communities, particularly those in drought and flood prone areas, have generated a vast body of Indigenous Knowledge on disaster prevention and mitigation through early warning systems and preparedness (Roncoli et al., 2002; Anandaraja et al., 2008). For example, in Zimbabwe, local communities have been coping with drought by integrating contemporary and indigenous climate forecasting (Shumba, 1999). Using IK in weather and climate prediction, local communities in different parts of Southern Africa have been coping and adapting to increased climate variability, normally manifested in the form of increased frequency of both droughts and floods. Before the establishment of conventional weather and climate forecasting, older generations, especially in the rural areas in several ancient cultures have largely relied on Indigenous Knowledge to predict weather through observing and monitoring the behaviour of animals, birds, plants and insects (Kihupi et al., 2002; Mhita, 2006). In spite of all these benefits, IK in weather and climate prediction is under threat of disappearance. Because, lack of systematic documentation of the knowledge, lack of co-ordinated research to investigate the accuracy and reliability of IK forecasting and finally when old people who are the main custodians of the knowledge pass away, the knowledge which has been accumulated for many years is lost. In this study, it is argued that IKS can provide significant value and boosts in the improvement of forecasting accuracy and reliability if it will be systematically documented, researched and subsequently integrated in conventional forecasting system of so called scientific world. The documentation of IKS will be a good

resource for the establishment of IK forecasting database and will be an important resource in the establishment of effective adaptation strategies to lessen the impacts of climate change. The study was, therefore, undertaken with two main objectives. The first objective was to identify, analyse and document local indicators used in IK forecasting over the world. The second was to assess perceptions of local communities on the application and reliability of both IK and conventional forecasting in their daily lives, agricultural activities included, in order to identify the gaps and the need for improvement.

Indigenous knowledge used throughout the world

The science of making forecast on a future event based on observation is termed as presage biology. That can be based on phenology that is the study of cyclic and seasonal changes in climate, plant and animal life. Meteorological findings are also used for this purpose from very ancient period of time. In this section, we are going to discuss a number of such traditional ways of prediction in various folk cultures throughout the world, studied so far.

Prediction from plants

Wild fruits, such as mukute (water berry), when show significant flowering starting from July through October indicate signal of good rains in the coming season (Chang'a et al., 2010).

The Ghamabat tree is also an important indicator in making a prediction of weather by the people of Thar. As they are Ghamabat also appeared in different months but the prediction of rainfall is only done in the months of June. This tree shrinks and does not look green and drops its all leaves. The indigenous people now predict that there will be rainfall. If this tree in the rainy seasonal does not drop its leaves and branches, there is no chance of rain (Ahmed, 2006). In Mahenge and Ismani, Tanzania, the Mwembe or Mango tree when shows a significant flowering indicates a

potential drought season (Kijazi et al., 2012).

Prediction from animals

Cow is also used for prediction. When the cow sits, if it has got three legs under itself and one leg out it means that the cow is calling for the rain. While walking if the cow squirts and go for from the place of the squirting and if the cow returns to smells the squirt then it sign of rain. It is also understood the sign of rain when the cow sits on the sand. If the cows lick each it is the sign of drought. This prediction is done in the months of June, July, August, September and October. But it is mostly done in June native month (Sawan). In this month the shoulder of cow turns to black by the clay and it is the first indication of the prediction of the rainfall and after 10 or 15 days the rainfall is done. whereas in this month if cows tastes each other then it is predicted that now this will be the month of famine and there is no any aspect of rainfall. This prediction is in the Mythology of the indigenous people so also consider as the source of prediction of rainfall and that is the main source of their living (Ahmed, 2006).

Prediction from insects

Senene or Grass-green grasshopper (Hesperotettix speciosus) occurrence in huge quantity in a particular year indicates less rainfall and hunger (Kijazi et al., 2012). black and brown ants collecting food in the houses in large numbers impending rains and long wet spell, whereas these ants bring out the dead and damp food after a wet spell indicates short dry weather after which the rains will resume (Makwara, 2013).

Prediction from birds

When a black crow builds a nest in an area, swallows and water fowls lay eggs on raised patches in river valley, water fowls breed on the ground under cover of grasses and reeds indicates that the area would not receive rains because the birds would not risk its eggs going bad. So low rainfall to

drought conditions will be expected (Chang'a et al., 2010).

Singing of the Dudumizi or Coucal (Centropus ssp) especially early in the morning hours in October and November is the sign of imminent rainfall onset and a good rainfall season in Mahenge and Ismani, Tanzania (Kijazi et al., 2012).

Prediction from climatic factors

Strong Wind during the month of July through October indicates less rainfall in the upcoming season (Chang'a et al., 2010). High Temperature on October and November Signifies near rainfall onset and the prospect of a good rainfall season. Cold weather on July Indicates possibility of hail stone (Chang'a et al., 2010).

Prediction from sun, moon and stars

For the people of the Thar, according to the key informant Abdul Yaqoob 70 years old, the recent appearance of lines in front of sun, which they called (MOGH), made villagers to predict that there will be rainfall. It is more accurately predicted the rainfall when these lines appear during the sunset. After the prediction there will be heavy rainfall within 5 to 10 days. The line which appears on the sun looks like rainbow. These lines are cut in the middle and the color of these lines is yellow and blue. This process of the line on the sun is also called (Bandi). If Bandi is seen on the sun they predict rainfall with certainty. The appearance of the darkness on the sun is also the mark of rainfall (Ahmed, 2006).

Dark moon in July accompanied by cold, ICE and snows fall signifies good rainy season (Chang'a et al., 2010). The stars are also serious indicators for making prediction for the people of Tharparkar and other countries of Asia and Africa, Zimbabwe, Tanzania, and India. They say that if there is a star in the sky and it appears after the sun set during the months of Sawan, and Akhaar, then there will be heavy rainfall. In these months a star named by the native as "Sanjhi", is appeared then it is predicted that the heavy rain will be fallen otherwise not. Apart from that it is also an indicator

of bad time. There is another star named by the native as Khatar star which appears after every 40, 50 years. They say that when it appears in the sky we feel that it is very near to the earth, and it appears very clear and unique. They say that when this star appears the coming time will be of the prosperity and that in future time will be good for their cultivation of the fields (Ahmed, 2006).

Discussion

Climate change is one of the biggest challenges to modern scientific society. Climate change has an immense effect on economy and aspects of life in diverse ways. Forecasting is required to face the challenge and mitigate the same. Forecasting on climate change is broadly based on the previous records of observational data. A nearly perfect forecasting may reduce the adversity of the effects due to climate change.

In this study, we have seen that indigenous folk people can predict the minute changes to be taken place in near or long-term weather. They have a very intimate observational relationship with their nature and therefore their knowledge are very much valuable for forecasting the climatic changes.

For instance, Among the indigenous rainfall prediction indicators that farmers in Zaka use the density of spider webs in their locality, with a lot of spider webs indicating a very wet season (spiders don't want damp or wet conditions). Also when spiders close their nests, an early onset of rain is expected because spiders do not like any moisture in their nests. They also look at the circular halo around the moon, known locally as dzivaremvura, to predict the wetness of that particular period of the season. Other indicators include animal and plant behaviour, as well as wild fruit availability and wind direction prior to the rainy season (Chang'a et al., 2010).

Although these indicators can be said to be indigenous, they certainly show some level of dynamism and integration with western science which also use wind direction to

predict rainfall patterns. According to The Food and Agricultural Organization (FAO) (2004), in Zimbabwe, only 3% of farmers use climate information for planning purposes. Some of the reasons given are that the information is not received on time and that farmers do not trust the meteorological information. Although framers listen to weather forecasts from radios, the poor and the marginalized farmers prefer to use their traditional knowledge system as a control. This was discovered from the research conducted in several study area that farmers rely more on indigenous knowledge and speculation in the absence of conventional weather reports. Often, there is a striking similarity between indigenous and contemporary weather indicators. Some indicators such as wind direction, clouds and temperature are the same in both systems. Farmers associate heavy production of tree leaves with a good season while high fruit production is a sign of a poor season. The reasoning behind this observation is that high fruit production implies that people will be living on fruits for lack of alternative foods.

Not only edaphic factors are considered for the prediction of weather, but also the living world has a great contribution for this purpose. Such as, The breeding patterns of game animals like the impala, kudu, birds, and bushbuck etc are also used in seasonal forecasts and disaster prediction. When game animals give birth in large numbers, it signifies a normal to above normal season and the reverse is believed to be true. Most tropical animals become fertile when day length is short so that they parturate in summer when food is abundant (Mount, 1979).

A very good example of animal ability to predict disasters could be what happened recently when the Tsunami struck. Despite the loss of huge number of people, wild animals seemed to have escaped the Indian Ocean tsunami, proving the notion that they possess a "sixth" sense for predicting seasonal quality and impending disasters (Planet ark,

2004).

Indigenous Knowledge are those forms of knowledge that the people of the formerly colonised countries survived on before the advent of colonialism (Mapara, 2009). Indigenous knowledge was denigrated, despised and ridiculed by the colonialists portraying them as not only non-empirical but also as primitive, superstitious, backward and living in the dark and thus out of touch with civilization. Communities developed traditional ways of weather forecasting that helped them to plan their activities for at least few days in advance. Indigenous ways of knowing have also brought forth useful knowledge on medicine and health. When indigenous knowledge gets adopted for widespread use, it becomes common or traditional knowledge. And this way it becomes subjected to change or improvement by the users without any control or reference to the original source. Therefore, the original idea, knowledge, skills and practices can be improved over time according to the influence of outside information or may even be abandoned in favor of new technology which is considered better. It becomes therefore hard to distinguish between indigenous and scientific/western/modern knowledge in some situations. In practice IKS are holistic and integrated into the culture.

The threat over the indigenous knowledge is that it is resident only in the head of the beholder. Unfortunately when they die, their knowledge also die with. In the absence of documentation of this knowledge, the surviving generations can only misquote and misinterpret them. According to the second Africa Environment Outlook (AEO-2), published by the United Nations Environment Programme, traditional knowledge has been overlooked in the past and, in some cases, is actually being lost. It has been observed that the skills to identify, collect, and develop indigenous knowledge into contemporary usable formats are needed to ensure the sustainability of this knowledge. Without that, the idea on the

promotion of merging local knowledge and modern science for sustainable development will be futile.

References

Ahmed, C.L., (2006) Indigenous knowledge about Prediction in climate change.

Anandaraja N., Rathakrishnan T., Ramasubramanian M., Saravan P., and Suganthi N. S. (2008). Indigenous weather and forecast practices of Coimbatore district farmers of Tamil Nadu. Indigenous Journal of Traditional Knowledge. Vol. 7 (4), pp 630 – 633.

Chang'a, L.B., Yanda, P.Z. and Ngana, J. (2010). Indigenous Knowledge in seasonal rainfall prediction in Tanzania: A case of South Western Highland of Tanzania. Journal of Geography and Regional Planning. Vol.3 (4), pp. 66 – 72.

Kihupi N. I., Kingamkono R., Rwamugira W., Kingamkono M., Mhita M., and Brien K. O. (2002). Promotion and Integration of Indigenous Knowledge in Seasonal Climate Forecasts. Consultancy report submitted to Drought Monitoring Center (Harare, Zimbabwe).

Kijazi, A.L., Chang'a, L.B., Liwenga, E.T., Kanemba, A. and Nindi, S.J., (2012) The use of indigenous knowledge in weather and climate prediction in Mahenge and Ismani Wards, Tanzania . Proceedings of the first Climate Change Impacts, Mitigation and Adaptation Programme Scientific Conference.

Makwara, E.C., Indigenous Knowledge Systems and Modern Weather Forecasting: Exploring the Linkages, Journal of Agriculture and Sustainability, 2 (2013), Number 1, 98-141.

Mapara ,J.(2008) "Indigenous Knowledge Systems in Zimbabwe, juxtaposing post-colonial theory". Journal of Pan-African Studies Vol.3 No.1pp139-155

Mhita, M. S. (2006). Training manual traditional knowledge for nature and environmental conservation, agriculture, food security and disaster management in Tanzania.

Mount, L.E. (1979) Adaptation to Thermal Environment, Man and His Animals. Edward Arnold. Ltd. Bedford Square. London.

Nakashima, D.J., Galloway McLean, K., Thulstrup, H.D., Ramos Castillo, A. and Rubis, J.T. 2012. Weathering Uncertainty: Traditional Knowl-

edge for Climate Change Assessment and Adaptation. Paris, UNESCO, and Darwin, UNU, 120.
Planet Ark,(2004). Where Are All The Dead Animals? Sri Lanka Asks. Reuters Limited.http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/news-id/28732/story.htm#top
Roncoli, C., Ingram K., and Kirshen P. (2002). Reading the Rains: Local Knowledge and rainfall forecasting in Burkina Faso. Society and Natural Resources. Vol. 15, 409 – 427.
Shumba, O. (1999). Coping with drought: Status of integrating contemporary and Indigenous climate/drought forecasting in communal areas of Zimbabwe. Consultancy report. UNDP/UNSO, 72.

Reading Samhita Arni's The Missing Queen as a Critique of "India Shining"

Dr. Somrita Dey (Mondal)

In the year 1991, economic liberalisation was initiated by the then Prime Minister of India, P.V Narasima Rao and his finance minister Dr Manmohan Singh. These reforms that were 'pro-market in orientation' sought to 'open Indian markets to competition, reduce government control, encourage private investment and participation, liberalise access to foreign capital and attract foreign investment' (Ghosh 1). Post 1991, liberalisation became the economic principle of the government irrespective of whichever party came to head it. This new project came to be celebrated as 'the magic formula for the reduction of poverty and for economic and social progress' (Chowdhury 1) and statistical data comparing foreign reserves, growth rate, foreign investments in the pre and post liberalisation phase were cited to validate the feasibility of the reforms. The laudatory narrative of liberalisation thus generated another discourse, that of a "Shining India", a brand New India luxuriating in its new found economic prosperity. Though the catchphrase "India Shining" was used by the Bharatiya Janata Party as its slogan for the 2004 general elections, it however outlived its political tenure and assumed the proportion of a 'vision' (Fernandes 193), of an 'idea' (Brosius xii). This 'metaphor' that sought to promote India 'as the future global superpower of the twenty-first century, a country of unrestricted opportunities and achievement' (Brosius 1) continued to animate the imagination of the people even after the defeat of the BJP in the said election. The transformations that economic liberalisation brought about not only engendered the idea of a 'Shining' India, but also of a 'New' India that has 'almost come into being, enshrined within the universalizing parameters

of global capitalism' (Chowdhury 38). These epithets like 'Shining' and 'New' projected a utopian image of a country that had supposedly entered an era where possibilities of upward mobility have rapidly escalated. These expressions especially focused on the transformation, the economic reforms brought about in the lifestyle of the middle class and the metamorphosis the Indian urban locales underwent. High rises, shopping malls and housing complexes ubiquitously proliferated in the towns and cities of the nation post 1991.

Samhita Arni's The Missing Queen, situated in an undisclosed era, employs the basic plot of the "Ramkatha" to offer an explicit critique of the narrative of "India Shining". Though the fictional space is devoid of precise temporal markers, the very setting of Arni's narrative, Ayodhya, with constant references to a booming economy under the leadership of none other than Ram himself make the contextual specificity of the novel quite apparent.

Arni's fictional locale unites the discourse of economic boom and Hindu nationalism in being denoted as 'shining' (Arni 11) Ayodhya. Arni attempts a deconstructive, against the grain reading of the "Ramayan" narrative. She aims to retrieve the supposed mini-narratives and the inaudible silences through imaginative recreation of figures and episodes that have suffered inadequate representation. By applying the said narrative strategy, Arni at many instances highlights certain aspects that counter the exalted image of Ram – many of which have already been touched upon in quite a few preceding anti-"Ramayan" narratives. Her contribution, however, lies in her strategic utilisation of the known perspectives to launch a scathing attack on a new set of discourses that has been ushered in the twenty first century and in constructing a racy narrative out of a familiar story. Arni's novel draws upon the basic plot line of the "Ramkatha" and metamorphoses it into a speculative thriller, where the 'missing queen' Sita triggers off the interest of a particular

journalist who eventually embarks on a perilous journey to unravel the nebula of mystery surrounding Ram's wife. Her relentless perusal of the missing links surrounding the Ram-Ravan war brings her face to face with the unsavoury truths about Ayodhya-- truths that can unsettle the entire nation and jolt it out of the stupor of complacency. Her propensity to dig out unpleasant facts incites the all-powerful, ubiquitous secret police of the country and their formidable, mysterious head – the Washerman. Arni weaves the thriller element out of the hiatus that her protagonist discerns to be existing between the popular perceptions that common people nurture and what strikes her as more convincing truths when she starts exploring the forbidden arenas that are meticulously screened from the general.

Arni grounds her novel on the tenets of those anti-"Ramayan" narratives that contest the supposed white Aryan Brahminic prejudice of the traditional story. She further reinforces her stance by flipping the formulaic conception of the colours white and black that forms the crux of the racial discourse. In keeping with the racial criticism of Ramayan ,Arni associates "white" with Ayodhya and "black" and "darkness" with everything that stand in contradistinction to the Ayodhyan principles, and then goes on to undermine the positive signification of the more privileged colour. Arni metaphorically represents Ayodhya's descent from the revered pedestal by desecrating the colour white which functions as the Ayodhyan insignia in the text. Arni divests white of its positive signifiers and invalidates its prestige, while black receives a proportionate escalation in status. However, her novel, does not remain restricted to the task of contesting white superiority but takes on an even nuanced role of interrogating the discourse of shining India, as the motif of the "white" coalesce with the sheen and shine that Ayodhya evince. In the present text, the colour white is illustrative not of Ayodhya, but of a shining Ayodhya and therefore the

devaluation of white comes not just as a condemnation of Ayodhya but also as a negation of the narrative of opulence associated with the epithet of shining.

In the novel , an Ayodhya ten years after the Ram-Ravan war , is vigorously modernised, made to resemble New India with 'polished pavements', ' steel skyscrapers ,as tall as mountains', ' steel-and-glass offices' peopled by 'bright suited, corporate workers'(Arni 41) with the most potent mouthpieces of the country - the television and the newspaper dishing out at a strutting regularity, tantalising pictures of the country for the people to gorge on. Arni's depiction of Ayodhya with repeated assertion on its glamour quotient and the role of media for fostering progressive images of the nation evoke suggestion of the twenty first century India. Ayodhya's self- proclaimed utopian magnificence is an implicit reminder of the notion that corporate media tries to instil in the Indians regarding its newfound glory. That Arni's fictional locale exemplifies the discourse of economic optimism circulated in post liberalised India becomes explicit through the very title of the opening chapter of the novel, 'Ayodhya Shining' and through the use of such epithets as 'New', 'booming' 'gleaming' (Arni 11). Thus at the very onset of the novel by depicting a correspondence between fictional Ayodhya and post-millennial India, Arni makes this quite obvious that the events that would unfold in the course of the narrative, too, would have reference to matters of contemporary relevance.

Ram's speech on the role of women as 'custodians of culture' (Arni 30) and their significance in the project of ushering in a new era bespeaks of a similar anxiety in relation to the construction of an ideal womanhood in the wake of liberalisation. Rupal Oza notes how 'the figure of the new Indian woman came to occupy a central locus of concern within middle class public debates because the anxiety associated with a globalizing nation state was displaced onto women's

bodies and practices' (Oza 24). Women's subjectivity became indicative of the nation such that the changes the former registered under the forces of globalisation were conceived of as an illustration of the metamorphosis the latter underwent. In Arni's novel Ram too believes that the process of democratising the nation is integrally related to the task of enlightening the women about democracy. The project of empowering women, however, seems fallacious when viewed from the perspective of characters like Kaikeyi and even Sita who offer a vituperative criticism of Ayodhyan life. In the fictional world of the novel as in popular discourse, Kaikeyi has a notorious reputation. She is perceived as a devious woman responsible for ruining the family's happiness and sending Ram to exile. Arni, however, provides her character with the scope of voicing her story when her protagonist comes to interview the alleged 'demoness' (Arni 4) of Ayodhya. Her words come as a revelation of the patriarchal leanings of the Ayodhyan society that in spite of all its apparent engagement with woman empowerment curtails their freedom and restricts their expression. Her narrative subverts the feel good aspect of Ayodhyan utopia. She castigates Dasaratha as a lamentably weak, ineffectual man, perennially incapable of making decisions, who used to depend on her for 'strategizing' (Arni 5), and shepherding his troupes on the battlefield. Accomplished as she was, she proved very useful during the wars and even at one instance saved her husband's life. When in return Dasaratha wished to proffer a gift, she out of sheer motherly concern demanded the bestowal of the royal crown on Bharat. She vehemently decries her deprecatory projection by Valmiki and the media as 'some beguiling siren who ruined Dasaratha and Ayodhya' (Arni 5). She on the contrary 'wanted to create … a nation unlike any other that existed in India' (Arni 6).

According to Kaikeyi herself, in spite of adeptly governing the nation, she never earned any repute in popular rep-

resentation because, she was 'more manly' and proficient in handling the royal duties than her husband. This resulted in her ostracisation in a society, pitiably patriarchal and hence forever dismissive of strong women. She thus registers her protest against the much aggrandised notion of Ram as god incarnate and vilifies him as an utterly self-centered person whose obsession with righteousness has only served to spell doom. In spite of all the injustice she has suffered, she knows that her grievances would never see the light of the day, for these are stories 'that the loyal citizens of Ayodhya and … puppet newspaper may have trouble swallowing' (Arni 7). Arni underscores the politics inherent in media representations and the fictional nature of documented narratives where truths are dexterously manoeuvred and manufactured. She expounds the fact of media bias as it engages in selective depiction of facts and omission of grim realities in its allegiance to the narrative of a prospering nation.

The issue of skewed representation in the government-patronised platforms that is categorically underscored by Arni is perhaps a reflection of the role media played in the project of economic liberalisation and in perpetuating optimistic images of "India Shining". Just as in Arni's fictional world media works in correspondence with the state, in the post-millennial scenario too, 'commercial and state advertisements play[ed] a crucial role in expressing and justifying the liberalisation agenda' (Chowdhury 69). It is through the advertisements that promising images of New India peopled with affluent middle class were constantly circulated to instil belief in the mind of the citizens regarding the new government endeavour. These advertisements always exude a feel good, optimistic vibe, which is also the concern of the editor of the newspaper in which Arni's protagonist works. Arni's novel, plays up the problematic inherent in the process of representing facts and highlights the fallacy underlying the authenticity of the supposed factual truths.

In Arni's fictional world, Ayodhya degrades from a mythic Arcadian space of Hindu consciousness to a cloistered locale .The magnificence of white and the prosperity of Ayodhya are however undermined by its uncanny association with the spectral figure of the Washeraman. He is the secret eye of Ayodhya, 'one who stalks the streets of Ayodhya at night' (Arni 42), dealing with crime and vice. Under his surveillance Ayodhya transforms into a potential Benthamite panopticon as the citizens are constantly haunted by the feeling of being watched. The structural alignment of the prison tower proposed by Bentham allows the guard to keep an eye on every prisoner, which instills in the inmates the consciousness of being under constant scanner that subsequently engenders self-control in them. The citizens of Ayodhya experience a similar anxiety because of the apprehension of being always under the patrolling gaze of the Washerman. According to Foucault, the modern society with the ubiquitous hidden cameras, CCTVs and security guards that keeps everything under strict vigilance is actually functioning on the principle of the Benthamite Panopticon. The modern urbanscapes as projections of the Benthamite prison tower is manifested through Arni's Ayodhya that is haunted by the omnipresent gaze of the Washerman. A washerman's purpose is to 'wash clothes, bleach and iron them' (Arni 12), remove all traces of dirt, thereby rendering it 'spotless, starched, and crease-free' (Arni 12). Similarly Arni's Washerman, as some sort of head of the surveillance agency of the state aims at purging the society of corruption and insurgent activities that might deter the smooth functioning of the government. His professed aim therefore is the preservation and perpetuation of a squeaky clean state at its unsullied best through extirpation of the seeming evils. This necessitates the criminalisation and subjugation of all voices of dissidence as that of Kaikeyi's, Sam Boo Kha's, the LLF's, the flawed representation of the Lankans, and also Sita's expul-

sion from the premises of a reportedly progressive Ayodhya.

Samhita Arni's text becomes a site where the past and the present interact to lend relevance to the narrative.The anti-Ayodhyan groups like the The Lankan Liberation Front and the Sam Bhoo Kha's men evoke suggestions of such organizations like the United Liberation Front of Assam .The UlFA was founded in the year 1979 with the purpose of establishing a sovereign socialist Assam. Political theorists are of the opinion that ULFA is a natural culmination of the Centre's persistent neglect of the region that has ultimately laid it back from economic development and jeopardised their sociopolitical identity. Sam Bhoo Kha and his peers are symbolic of such local ethnic groups whose concerns do not harmonise with the prevailing current of the nation and hence are denied attention. The character of Sam Bhoo Kha is also redolent of Shambuk of the previous "Ramayans", a Shudra slain by Ram for the alleged sin of appropriating Brahmin prerogatives. The killing of Shambuk is one of those few incidents in the "Ramayan" that generates unease concerning Ram's fabled righteousness. The detractors of "Ramayan" discourse perceive the incident in the light of the story's Brahminic prejudice that justifies the brutalisation of low castes. Through a strategic twist, Arni transforms the character of Shambuk into Sam Bhoo Kha, the leader of a dissident indigenous group –their similarity being in the persecution they have faced in the hands of Ram and his Ayodhya. In the novel, Sam Bhoo Kha's people are to Ayodhya what the thousands of ordinary non metropolitan citizens are to New India -'an uneasy distraction …remnants of the old that must be managed, the detritus of a "third world" past' (Chowdhury 45). Sam Bhoo Kha narrates the grim reality of their lives-- the exploitation they suffered in the hands of the state and their exclusion from the premises of shining Ayodhya. He talks of their community as an indigenous tribe of the northeast that followed the matriarchal pattern

of society where 'women … enjoyed a degree of freedom that was not customary in Ayodhya' (Arni 143) .Thus pretending to bear the torch of civilization they took possession of their territory. They were coerced to surrender their lands, were robbed off their independence, tortured, brought to Ayodhya and hurled into a life of backbreaking labour. Ayodhya soared on the wings of their toil, while they kept languishing in misery. Their grievances explicitly allude to the grievances addressed by the ULFA. In spite of being rich in natural resources and contributing substantially to the assets of the nation, Assam remained backward because of centre's indifference to its cause. Sam Bhoo Kha's men nurture similar grievance against Ayodhya. They have generously worked for the development of Ayodhya, but they are still to get their due recognition. They typify the peripheral impoverished group of Indians. They constitute a substantial part of the population who are excluded from the narrative of New India and are kept out of the privileged category of the new Indian subject. Arni through the information that her protagonist gathers during her interaction with the alleged terrorist group, illustrates what constitutes the other side of the shining facade of the nation. The harsh realities of Arni's fictional Ayodhya are actually indicative of the realities of India at large.

Chowdhury refers to the unpalatable realities of New India, where a considerable section of the population is not accommodated within the narrative of "India Shining" and whose primary grievance is the unequal treatment they are subject to by the state. Sam Bhoo Kha's men are suggestive of the lot who are persistently fighting for their rights.

The very name 'Sam Bhoo Kha' constituting of the term 'Bhookha' that means hungry, is indicative of the destitution of the people whom he represents. He demands expression in the recorded narratives of the nation, which space is denied to them by the media. Sam Bhoo Kha complains, 'The media

doesn't acknowledge us. We are invisible in the eyes of the state' (Arni 145). Such enforced ignorance of unpalatable facts is defined by Mander as the 'culture of social avoidance', the phenomenon of 'invisibilizing' the poor' (Mander 5). It characterises both the citizens and the government of a globalising nation who are too preoccupied with 'market-led growth' to heed to the 'reminders of the large unfinished business of mitigating the suffering of the huge underclass' (Mander 5). To hush up the serious causes of concern that might tarnish the reputation of the progressive discourse of "India Shining", government employs several strategies like the policy of imposing invisibility on the economically and socially marginalised . This is achieved by disallowing them representation in recorded narratives. Their complaints are not registered, they are not spoken about in any government-backed platform and their stories are not chronicled in any official report, to blot them out of existence. The episode of Sam Bhoo Kha's men is a similar case in hand. In Ayodhyan Daily, Sam Boo Kha is merely a passing reference more of a 'laughing stock', a villainous figure 'accused of treason and disturbing the peace' (Arni109). Not only are they denied voice they are even given the status of criminals. The criminalisation of the poor is also an ubiquitous phenomenon in New India where ' Governments claim that the poor need to be ejected not just to clean up the city, but also to make the city safe both from terror- related and 'regular' crimes' (Mander 23). Mander cites an incident where the policemen instructed to 'flush terrorists out of the city' starts assaulting 'sleeping homeless people' (Mander 23). In a similar vein, Sam Bhoo Kha's men are brutalised and criminality ascribed to them to lend justification to their ill treatment in the hands of state machineries. Arni underscores the media's entente with the state in fostering the state agenda and proscribing unsavoury facts, which contradict the state interests. The domain of "India Shining" thus is a constricted

one, that, to cater to the fancy of a privileged few and the foreign investors, allows 'no dark spots on the glossy façade' (Brosius 5). In Arni's fiction it is the washerman who administers the metaphorical cleanliness of Ayodhya by forceful suppression of the elements of supposed disruption and strategic elimination of everything that runs contrary to its much hyped splendor..

Her novel thus interweaves issues of contemporary concern with the basic narrative premise of the ancient story. Arni employs the "Ramkatha", contests the revered status of Ram and Ayodhya, thoroughly deglamourises its opulence by emphasizing the disagreeable realities that underlie its orderly facade with the aim of interrogating the flamboyant optimism associated with the tenets of "India Shining".

Works Cited

Arni, Samhita. The Missing Queen. Penguin Group, 2013.

Brosius, Christiane. India's Middle Class: New Forms of Urban Leisure, Consumption and Prosperity. Routledge, 2010.

Chowdhury,Kanishka. The New India: Citizenship, Subjectivity, and Economic

Liberalisation. Palgrave Macmillan, 2011.

Fernandes, Leela. India's New Middle Class:Democratic Politics in an Era of Economic Reform.University of Minnesota P, 2006.

Ghosh, Madhusudan. Liberalisation, Growth and Regional Disparities in India. Springer Science & Business Media, 2013.

Mander, Harsh. Looking away: Inequality, Prejudice and Indifference in New India. Speaking Tiger, 2015.

Oza, Rupal. The Making of Neoliberal India: Nationalism,Gender, and the Paradoxes of Globalisation. Routledge, 2006.

The Development Rhetoric: A Cosmetic Cover

Sunandita Sarker

A mid-morning view of any connecting or main road of any town or city will show an insane traffic with horns blaring, slow moving cars , veering bikes and cycles, hawkers shouting, school children running helter skelter, pedestrians in a rush and in the midst of this hurried instinct is the contrary leisurely movement of buyers selecting vegetables and fruits from carts oddly encroaching the road and contributing to the traffic; the clear and present danger of fish knives and hot oil of fried food are also present in this chaos. The impatience of trying to reach on time is juxtaposed with the leisurely market goers and casual walkers. Traffic rules for safety are severely mocked at by the encroached sellers with knives and hot boiling oil. The frustration of the daily commuters is unacknowledged due to the economic pursuit of the seller. The tax payer's right finds no consequence because of the monstrosity of the problem of overpopulation and economic desperation. This confusion and chaos have unfortunately become a cultural semblance as the culture of Excess. Undesirable, it may be, but nevertheless this unholy alliance of lawlessness and condoning the rules of the road has become an accepted feature in India. The complaints are usual, the quarrels too and sufferings are all too common. But the obvious question that arises is- Why no rules are followed? The answer to this would unravel a tirade of arguments and observations impossible to incorporate in one single document. However, this lack of a fair system and rules and discipline is not singular to road traffic alone, but in every aspect of public and private sphere.

The statement that India is a developing country has been in circulation and perception for the past few decades. But the developments reported are rarely felt as experiences of arbitrariness continue and the collaterals of these "Developments" have a noisome impact on the masses. Rabindranath Tagore had observed

in Nationalism, " Our real problem in India is not political. It is social". The statement made with regard to colonial domination, holds significance even 76 years after Independence. Tagore applauded the social cohesion of the West and cited it as one of the reasons for their success in colonial ventures. This social cohesion is still lacking in India. The social implications of democracy are yet to be realized. The shift from a feudal society to a political democracy was a ceremonious one and not an intrinsic collective desire. The subsequent juxtapositions of nostalgia and progressive ideas have created an ambiguity that has proven detrimental to clarity in thinking and we are caught in a perpetual state of confusion. Principles of democracy and demands of modernity are not in league with the claims of tradition and cultural essentialism. For example, the youth learning about liberty, equality and fraternity in schools finds caste, gender and class inequality at home. The frequent hypocrisy in private and public spheres translate into a cultural and systematic habit, that helps corruption and lawlessness to thrive. While it is recommended that every citizen should abide by civic laws, the reality is that there is a lack of monitoring and proper opportunities of execution are unavailable. For instance, in the absence of proper collection and segregation of garbage, people are compelled to throw things here and there. The illegal encroachment on pavements is so common that one wonders if it is a government property at all. Enforcement of law is retarded by malpractices for monetary benefits. Overall there is so little reaction and so much disorder that the common citizen has internalized and accepted the hassles and malpractices and considers it a defining feature of this country. Responsible citizens lose motivation at the sight of blatant lawlessness and choose to look the other way and become careless. To prevent disorder and lawlessness, order and law must be promoted by punishing the offenders and protecting the rights of the responsible citizen. Interestingly, despite decades of frustration oozing out of rampant corruption resulting in irretrievable damage to public health and wealth, things remain unchanged. In a democracy, it should have

been the agenda for election and should have been enough to lead to victory. Alas! That never happened. The simple reason being, it is not reason enough for the policy makers to lose their sleep over as the inconvenienced are the powerless common citizen, whose meagre strength lay in the vote, the nature of which is collective and becomes significant only if it is a majority. Interestingly, the majority accepts the inconvenience with a resignation that borders on indifference. The apathy towards the regular inconvenience and desperation of the general populace is easy to explain. The practice of disregarding the inconvenience of the common citizen is an ancient one. The arrogance of the landlord towards the tenant, the condescension of the higher caste towards the lower caste is a feudal one and the attitude persists in the elected representatives ignoring the living conditions of the citizens and directing and controlling all resources to ensuring their legacy of power . The rich and the politically powerful are not perturbed by the common hassles as privilege and entitlement allow them to escape these indignities. But the cause for concern is that the suffering majority rarely seethe with anger to force a change. This imperviousness is not easy to explain. Thomas Hobbes wrote in Leviathan, that mankind is generally selfish and without laws to restrain him, he will do whatever he needs to, in order to sustain his life, even it means stealing or killing others. Hobbes believed that mankind is by nature generally selfish and would, if left to his own devices, behave in such a way that he had a right to everything he wanted and in this situation, in the best interest of all it would be better for everyone to cooperate with one another. So, everyone would be required to enter into a social contract, where all would have to forfeit some liberties in exchange for something else. For example, one would not steal or kill and in return be promised safety, protection and peace of mind. This would require a "contract" and some mechanism of enforcement of the "contract" . A third party, person or assembly of persons, to whom we give our allegiance and consent to govern us, should enforce the "contract". Hobbes holds a very cynical view because he believes that there is ab-

solute liberty in Nature. John Locke differs from Hobbes as he believes that man is not completely free, as he is governed by the laws of Nature. In a social contract, man gives up the liberty to take justice into ones' own hands and settle any kind of vendetta or the ability to do whatever they feel like to preserve themselves. Hobbes preferred absolute monarchy but Locke recommends a democratic set up of publicly elected officials. Despite Hobbes' and Locke's contentions, both acknowledge the motive of self-interest behind all human actions and the need for a system of laws and proper enforcement that guarantees all citizens' Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. The responsibility of protection of the citizens rests with the Government, which can be achieved if there is an enforcement of the social contract. Therefore, formulation of a contract and enforcement of the same are necessary for a system that preserves the Rights of the individual and allows the individual to pursue happiness. The failure of the Government to bring into force a system leads to chaos and arbitrariness and a general degradation and corruption. To elaborate with an example: If a city needs to be kept clean with proper sanitary system, it would require a good sewage system, proper collection of garbage, separation of garbage, recycling of garbage and a proper management of waste. Beside necessary infrastructure and several paid individuals for carrying out different tasks, all citizens would have to abide by laws that prevent disposal of trash here and there and management of waste at the individual or household level. So, a clean city is the consequence of the joint efforts and cooperation of every member of the city. This cooperation and effort can be ensured only if laws are there in place and there is enforcement of these laws, as without enforcement all men would act out of self interest and the concern for the cleanliness of the city would lose priority and the city would exhibit the remains of the self centered and thoughtless indulgence of the people of the city. In this regard, the disregard for observance of civic rules in our state is not freedom or liberty or democracy, but absolute disregard for the well being, development of the country. A citizen

can run a vehicle without license, illegally encroach roads, build a house on government land and may get excused due to political support or by pleading ignorance or citing poverty as a reason. A rich or powerful person can manipulate anything from road traffic to seats in an academic institution or rank in any examination. The self-interest of a few are enforced at the cost and inconvenience of the majority resulting in a common hatred and disrespect for the state and the absence of a system of governance. True democracy is collective with all sharing the need to abide by laws and protection of the system of laws, lest everything descend into chaos.

The excellent and aggressive marketing of the State internationally by the Indian Diaspora, being extremely successful abroad, especially in comparison to other diasporas, has contributed to building a faith in our country and culture that has been well accepted worldwide. The multicultural, multilingual and multi-religious nature of our State definitely has its own attractions with the variety of cuisines and fabrics becoming a significant reason for tourists to come to our country. Multinational companies are willing to invest huge amounts to gain control of the market. All these might give the impression that India is a business destination and will witness a rise in economy, but the reality of the situation is far from satisfactory. The huge population is a good market for profit for any business. It is not a virtue to be the highest populated country and be a ground for foreign businesses. The rise of several India based engineers to the position of Chief Executive Officers in companies like Microsoft, Google, Adobe, Chanel, IBM, Pepsico, Starbucks, Motorola, Deloitte promotes the impression that Indian born engineers have replaced engineers from other countries, but what is often left out from the publicity writings is that salary is negotiable with Indian origin people. It is also easy to build a team with an Indian CEO and other Indian origin employees. This is conducive to profiteering and cost effective for the employer. Indians are willing to do anything to be successful and build a life abroad. The desire to settle abroad is so strong that they are willing to negotiate to work at a lesser

package amount and put up with immense struggle to build a life from scratch. The applaud and jubilation over the success of these engineers hide the sad truth that the state is unable to sustain its talented hard working citizens. The search for meritocracy compels them to look out of the country and the struggles and racist hatred that come in the way seem to be worth suffering than living in the country. An economy that cannot value its brilliant citizens or provide the opportunity to exercise their talents is a shallow one. Flawed democracy perpetuates injustices of a different kind. It is unsympathetic to the aspirations and pursuit of happiness of its citizens. It restricts the lives and keeps citizens confined to their places. The pursuit of self interest of the policy makers at the cost of the development of the state breeds depression and frustration that are often manifested in mob violence rampant in different parts of the country. Doles and free facilities strip off any opportunities of claims on the part of citizens. It does not hold the elected official accountable for anything. So, the free facilities handed to the citizen is actually a populist measure that relieves the politician from any responsibility, excuses the citizen from any contribution, thereby reducing any room for claim to higher standard of infrastructure to zero. The citizen in this case remains at the receiving end of the whims and fancies of the elected official. This is even more bizarre considering this is a democracy and the living conditions and livelihood are very limited and insecure. The lack of social cohesion and sincerity ,fostered through arbitrariness of the system have thwarted the progress and continuous incremental development of the state. The increasing dependence on other countries for employment of our people is a sign of hollow progress as the people are contributing to the economy of another country and serving the interest of another nation, while being underpaid and compelled to being a second class citizen in a different country. The tendency to search for a job elsewhere is not only among the educated elite but also among the working labourers , hoping to make more money as job opportunities are limited here. The dependence on other countries for employment

of our youth is a scary figure as one shudders to think that should there be a refusal or rejection from these countries, the exodus of people coming back to the state would find themselves severely financially challenged. The fragility of the situation is visible, but unseen.

In the midst of such vulnerability, the anxiety over Western cultural imperialism induces a frantic endorsement of traditional rituals and customs that are disenfranchising for the youth and especially for women. In the face of such crisis, encouragement for family expansion and desire for male child has contributed to rise in poverty and desperation among the youth. The dishonesty in public opinions to the employment problem has kept the truth hidden from discussion and has given rise to sugar coated solution that are illusory. The lack of space, lack of resources, unhygienic living conditions, the accumulation of waste, the sheer dearth of housing, the rural and urban divide, the excessive fascination with technology at the cost of agriculture are ground realities suffered by the common people of this country. The problems are so acute and so intense that the jubilation over success worldwide will do little to redeem the common person in the state. Of course, it matters little to the leader as it does not matter much to the common citizens themselves. That the political elites do not care or care as much as it helps them stay in power, is quite reminiscent of the landlord or Zamindar of the feudal times. Intrinsically, we have not become a democratic state and this begins in the family space itself. The disregard for the female or the aspirations of the young, the forceful extraction of domestic labour (unpaid) from the female and the systematic economic deprivation keeps power centred in the patriarch/matriarch where the dependants are rarely allowed to lead lives of respect and freedom. This internalization of humiliation and lack of autonomy is passed down as a cultural trait among generations, perpetuating social deformity and consent for desperate living condition. Principles of individuality, liberty, freedom and democracy are at odds with the traditional stereotypical family values. But nevertheless the latter has been endorsed

by our leaders and imaged as desirable to prevent changes in status quo. It is contradictory to encourage inter-caste marriage and encourage joint family system, it is even more hypocritical to call for women's education and emancipation and then impose the cultural and traditional baggage of good wife and mother and daughter-in-law on her shoulders, to teach the principles of equality and then expect one family member to serve others and eat last is a vicious ambiguity causing a schizophrenic split in the personal self of the individual.

India's accomplishments in space program, in medicine, in technological development are commendable and enviable. Providing food security for such a large population is no mean feat. But, the achievements don't ameliorate the suffering and deprivation of the majority. It is not charity but clarity in thinking that promotes growth and change at the grass root level and encourages every citizen to work towards personal development with a spirit of kinship towards our fellow citizens. Instead of identifying with poverty and making good with the unavailability of infrastructure, it is incumbent upon us to desire the necessary and fight for it. Right to food and nutrition is a Human Right, so is housing and access to proper toilet facilities and sanitation. That being said these are not immune to scarcity. Therefore, for proper management of resources and their distribution we cannot ignore that an ever increasing population is a huge liability, eating into the very core of progress. Ugly truths such as these should be openly discussed. Political correctness is a mere cosmetic cover for the decay within. Left unnoticed, it begins to eat away like cancer, ultimately killing silently the very fabric of society. Prioritizing individuality over herd mentality, protecting the rights of the socially weak, encouraging and promoting self sustaining businesses, balancing ecology with economy, valuing public health and sanitation over consumerism – are the need of the hour. Vandana Shiva in her work Oneness vs 1%, shatters illusions about development and 'wealth' creation that violate rights of diverse species of the planet as well as rights and freedom of most people. She

writes : "In 2010, 388 billionaires controlled as much wealth as the bottom half of humanity; this number came down to 177 in 2011; to 159 in 2012; 92 in 2013; 80 in 2014; and 62 in 2016; it shriveled to a mere eight in 2017. By 2020, it seems there will be ONE" (Shiva, vii-viii). Shiva's apprehension is that the money machine will destroy the planet and our societies from which it draws support. The development model of limitless growth is using up the capacity of the planet and is only to meet with the greed and corporate control of a few. The consequence is uprooting and dispossession and creation of refugees. Shiva concerns herself with the entire planet and apprehends the domination of "ONE power of Big Money" (Shiva, viii) but the same applies to India alone. The aggression of companies to maximize profits at ecological costs will fill up the banks of deal makers but destroy the livelihood of the people and the biodiversity of the place. Shiva pleads for all humanity to choose the path of oneness, "..living and celebrating our many diversities, interconnected through bonds of compassion, interdependence, and solidarity" (Shiva, 148). Her appeals are primarily to undo the domination of the few, who do not have any concern for the well being of the general population or the ecology. She says "It is an economic necessity because a 1% world will render the 99% disposable, extinguish our diverse creativities, potentials and possibilities. It is a democratic necessity because the rule of the 1% is a violent dictatorship. It destroys our fundamental freedoms and the freedom of all beings to evolve in an earth family"(Shiva, 149). Shiva's apprehension extends to the militarized concept of development perpetuated by the 1% that stress on limitless extraction, greed, profit, violence and power. The concentration of power in the hands of a few is dangerous. In a democracy, power goes hand in hand with responsibility. But in a flawed democracy, power is easily grabbed by a few and they work and manipulate to consolidate their power and attempt to keep things the way they are.

The development question should not and cannot be about profits alone. The physical and emotional wellbeing of the citi-

zen, opportunities for work, social justice, meritocracy, encouragement for abiding by laws, protection of the law abiding citizen, reprimand for the rule breaker, encouragement for fullest expression of talent, pursuit of economic sufficiency and social security; should be there in the Development rhetoric. The development rhetoric is inclusive of ecological concerns and protection of biodiversity. It should arise from a holistic outlook for all citizens and the environment . Thomas Jefferson wrote in The Declaration of Independence (1776) "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these Rights, Government are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the Government". The founding document of the United States asserted the importance of the Government in protecting the unalienable Rights of every citizen of the state. It cannot be ignored that acknowledgement of the equality of all citizens is the primary premise for creation of a state that allows meritocracy and subsequently incremental progress, that sums up as Development. The Declaration of Independence deeply impacted the Indian Counterpart the Declaration of Purna Swaraj, passed by the Indian National Congress on 26th January, 1930, marking for the first time the demand of a National Party for full Independence from British Rule rather than dominion status. Both the declarations begin with preambles that refer to the inalienable Right to life of every citizen. Even Subhash Chandra Bose's Azan Hind slogan pledged the Government's resolution to pursue the happiness of the nation. Therefore, Happiness of every citizen and liberty and Right to life, promised by our founding fathers should no longer remain unachieved and should be our goal now.

Works Cited

1. Hobbes, Thomas. Leviathan. Double 9 Books: India, 2023.

2. Locke, John. The Second Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration. Ch. 8. Oxford: B. Blackwell, 1948.

3. Siva, Vandana. Oneness vs the 1%: Shattering Illusions, Seeding Freedom. Women Unlimited: New Delhi, 2018.

The Changing Trends of Economic Indicators

Sohini Nath

Economics as a discipline has a long tradition, although the study of Development Economics began its journey in the 1950's.This was the time when many poor developing countries got independence and came out of their colonial rule. Poverty reduction was the main concern of Development Economics and it is applied in designing the strategies of development. Today its area of study has expanded length and breadth and focuses not only on economic dimensions but also on social and political sphere.

Development Economics thus encompasses a variety of issues. So the areas of relevance of Economics of Development are many and varied .It is concerned with not only poverty reduction but more importantly on the reduction of multi-dimensional poverty –the achievement of Millennium Development Goals –set by United Nations, sustainable development and clean-energy policies to save the earth from catastrophes, democratic governance and the removal of corruption and so on.

Every country desires to grow as time grows. The growth experiences of different countries are different. Some countries grow fast and achieve a lot in a short time while other countries reel under the vicious circle of poverty or low level equilibrium trap. So a wide difference exists between developed and underdeveloped countries of the world. In order to judge whether a country is developed or not a number of development indicators have been put forward by various economists. Although the first indicator used to judge the parameter of development was per capita income, but the indicators used to judge the position of the countries have changed a lot in the present.

Although the two terms economic growth and economic development may sound the same but they are not synonymous. Economic growth may be a necessary condition for economic de-

velopment of countries but it is not a sufficient condition.

The first in the line of development indicators was the Per Capita Income. Economic growth is associated with an increase in GNP/GDP per capita. Here real per capita income is used as an index for economic development. It was the most popular and widely used index of development. Higher the real per capita income, higher the level of development of a country and vice versa. But PCI as a development index had some limitations for which economists were quite dissatisfied with PCI as a measure of economic development. So after this economists tried to measure economic development in terms of some social factors and so they were called social indicators.

In this line the first indicator was Physical Quality of Life Index (PQLI) which was constructed by Morris D Morris and others. This is a composite index of three elements namely the life expectancy, the infant mortality and the literacy. The index will be highest for a country with most favourable life expectancy, the lowest infant mortality and highest literacy. The PQLI stresses the use of national income, not merely increase in national income or per capita income, which is more important to measure economic development. When national income will be used to improve the quality of food, improve health and educational facilities PQLI will improve which will in turn imply a higher standard of development. Naturally it is a little over PCI as development index.

Next we have Basic Needs Approach which was developed by Paul Streeten, Norman Hicks, Sahid Javed Bukri and others. The basic needs include food, shelter, drinking water, sanitation, health and education. The Approach does not disregard the necessity of raising income in these countries. It also does not disregard the indices of total production or of income distribution. It can be seen that the basic needs are basically the needs of the masses of underdeveloped countries.

It should be noticed here that poor people cannot collect the basic needs themselves and mere increase in their income may not help them to have their basic needs. So the government of an

underdeveloped country can directly intervene in this matter and help the poor people.

After the Basic Needs Approach the important social index which became very popular is HDI introduced by the UNDP in its first Human Development Report published in 1990. The index was prepared under the guidance of Mahbub ul Haq.

HDI is a composite index of three indicators which are longevity, educational attainment and standard of living. Longevity is measured by life expectancy at birth, educational attainment is measured by a combination of adult literacy (two-third weight) and combined primary, secondary and tertiary enrolment (one-third weight) ratio while standard of living is measured by real GDP per capita. A simple average of these indices gives us the HDI.

Thus on the basis of HDI index the countries can be ranked and thus serves an alternative measure of development which supplements the GNP measure of economic development. On the basis of HDI, countries can thus be ranked as high (Norway, Canada, U.S.A, Japan, U.K) medium (Mexico, Malaysia, Brazil, Srilanka, China, India) and low (Bangladesh, Ethiopia) human development countries.

But after this the notion of development changed and included some new concepts into it. For example economic development must encompass other parameters such as human development indicators. Amartya Sen, a leading thinker of economic development introduced some new concepts to development like 'entitlement' and 'capability'.

Entitlement refers to the set of alternative commodity bundles that an individual can command by using one's endowment. Entitlement of people generates capabilities. Capability on the other hand represents a person's freedom to achieve various functioning combinations. Thus the notion of capability is essentially one of freedom, which gives a person the range of options a person has in deciding what kind of life he or she wants to pursue. According to Sen economic development can be interpreted as a process of expansion of the freedoms that people enjoy. So the important ar-

eas where people faces unfreedom are famine, undernourishment, mass illiteracy, poor state of health, lack of shelter and other basic needs, economic insecurity, denial of basic civil and political liberty etc. These can be considered as 'elementary' capabilities. But there is another kind of capability, such as taking part in the life of the community. Thus, Sen has given more importance on quality of life which can be enhanced by increasing capability.

On this line comes the next index which became relevant is the Gender Development Index (GDI) or the Gender Inequality Index (GII).Of the various unfreedom that we talked about earlier, one more like gender-bias can also be included in it. Capability deprivation results in gender inequality. The biasness between men and women can be seen in case of nutrition, medical assistance, educational attainment, household decision-making and also politically.

To measure the extent of this disparity the UNDP in 1995 took a new initiative to construct an index called GDI. To close the gap between men and women, women have to be empowered. To measure the extent of empowerment of women, UNDP devised Gender Empowerment Measure (GEM) in 1995.An alternative to GDI(Gender Development Index) was introduced in 2010 as GII(Gender Inequality Index) . So on the basis of GII, disparities between men and women were measured. The higher the GII value the more is the disparity between men and women and more is the loss to human development. Thus on the basis of this index countries can now be ranked as very high, medium or low human development.

Over the last 50 years or so, there has been a lot of changes in development thinking. As we have seen that economic growth maybe an indicator of economic performance of a nation, but not for measuring social progress. Meanwhile growth for the sake of more growth has deteriorated the environmental quality. Therefore climate change and economic development have now become a challenge for all developed nations of the world. As a result development over the last 100 years have resulted in tremendous dam-

age to the environment. Thus the need of the hour is to minimize the cost of development and strike a balance between economic growth and preservation of country's environmental profile. This is the reason why the word 'sustainable development' has become so important. Thus for sustainable development it is important that the future generation should have the right to enjoy the same level of economic opportunities, the same level of welfare as current generation enjoys.

Although there is a difference between developed and developing nations about the interpretation of the meaning of sustainable development but everyone is in agreement with the fact that the solution to the current environment problem is implicit in the concept of sustainable development.

It follows from the above discussion that the nations should adopt such development programmes that can put an economy on the sustainable path. From this it follows that there is a set of sustainable indicators that may help us to understand whether an economy is getting better or worse.

Thus with the change in development thinking new measures of success have come to the forefront. At present social well-being have become important components of development. Thus social well-being has emerged as a substitute for wealth. Overall public happiness or satisfaction with life describes well-being. Therefore today economic progress of a country is to be measured not only in terms of GNP/GNI or poverty, unemployment, inequality but in terms of pursuit of happiness. Economic progress should be such that happiness levels of people across the society should be enhanced without damaging environment. Happiness of people is measured through surveys where people are asked how happy they are. This Happiness Index is called Gross National Happiness. Countries can be ranked on the basis of National Happiness score which can be attained when basic needs of the people are met. The basic needs are same as before like housing, health, employment, environmental protection, peaceful atmosphere, morality, and basic health care, preservation of cultural tradition of love,

respect and democracy.

The measurement of GNH (Gross National Happiness) is gaining ground and countries are being ranked now on the basis of GNH index which is nothing but an indication of social welfare. So according to GNH the happiest countries in the world (According to World Happiness Report) are as follows:

COUNTRY	HAPPINESS SCORE
1.FINLAND	7.804
2.DENMARK	7.586
3.ICELAND	7.530
4.ISRAEL	7.473
5.NETHERLANDS	7.403
6.SWEDEN	7.395
7.NORWAY	7.315
8.SWITZERLAND	7.240
9.LUXEMBOURG	7.228
10.NEW ZEALAND	7.123

Finland is the happiest country in the world, according to World Happiness Report 2023.This is the sixth year in a row that Finland has been named the happiest country on earth.

So the notion of development is changing day by day. Countries which were considered as developed (according to HDI) like the U.S.A., Canada and Germany are now far behind when comparison is being made on the basis of Gross National Happiness. In today's world with the effect of globalization which is impacting badly on environment has brought the issue of sustainable development to the forefront. Therefore Development Theories now can be no longer be thought of without sustainable development of the nation.

Thus from Per Capita Index to Sustainable Development the scale of development has changed a lot. For a country to be developed now requires not only a steady increase in per capita income but all-round development in health, education, living status, poverty alleviation, environmental protection, promotion of women's rights, state of mind or happiness. So economic development at

present can be thought of as a multi-dimensional index.

References:

1. Thirlwall: Growth and Development.
2. Debraj Roy: Development Economics.
3. Meier (ed): Leading Issues in Economic Development.
4. Debesh Bhattacharya: Political Economy of Development.

Title of the Paper – National Education Policy 2020 and Student DevelopmentScenario in India

Dr.Amrita Bhattacharyya

Abstract

There was a huge shift from theoretical education towards a more practical education according to the National Education Policy 2020. My paper would study this shift at the interface of the canonical study of English language and literature. Here I would also like to discuss the key points in National Education Policy. There was already a shift through traditional printed texts towards electronic texts, power point presentation, google classroom, audio, video, films, you tube and many others in the Covid scenario. In the current scenario UGC which is the highest body of decision making has implemented a syllabus stressing on practical acquirement of knowledge and skill development. In the English language and literature syllabus which has to be covered in three years through six semesters, Information and Communication Technology can be applied in a wide way in teaching most of the texts. NAAC (National Assessment and Accreditation Council) places a priority on student satisfaction survey in the evaluation of the status of the higher education institution. Till now library books were the only reference works students could avail to enhance their knowledge. But now they can refer to many texts available online.

Key Words: NEP, student satisfaction survey, ICT, online texts, google classroom

Full Paper:

National Education Policy stresses the need and demand for higher education among the youth of India. While primary education builds the ground for the young minds, higher education prepares the youth of India towards securing a bright future of sustenance. The newly developed syllabus has been developed in

such a way that stresses multidisciplinarity. Science and Arts have been combined in such a way and made flexible so that students can easily cope over streams. This will also prepare them technically for the job market. NEP takes its stand from India's ancient universities like Nalanda and Vikramshila which were high resources of learning –

"Moving to large multidisciplinary universities and HEI clusters is thus the highest recommendation of this policy regarding the structure of higher education. The ancient Indian universities Takshashila, Nalanda, Vallabhi, and Vikramshila, which had thousands of students from India and the world studying in vibrant multidisciplinary environments, amply demonstrated the type of great success that large multidisciplinary research and teaching universities could bring. India urgently needs to bring back this great Indian tradition to create well-rounded and innovative individuals, and which is already transforming other countries educationally and economically." (NEP 34)

My paper would study the interface of the canonical study of English language and literature through traditional printed texts and through electronic texts, power point presentation, google classroom, audio, video, films, you tube and many others. Such a collaborative venture is highly required for the purpose of student satisfaction and benefit. My observations are taken both from the teacher's and the student's viewpoints. The newly developed syllabus will help the students to find placement in the current job market. NEP is against the strict separation of disciplines as practised in earlier syllabuses. It also emphasizes a lot on research. It also acknowledges that many teachers are needed to implement such a systematic revision of our education system. Local or Indigenous languages are also severely encouraged to develop the knowledge base rather than only English.

In the current scenario UGC which is the highest body of decision making has implemented a syllabus stressing on practical acquirement of knowledge and skill development. In the English language and literature syllabus which has to be covered in three

years through six semesters, Information and Communication Technology can be applied in a wide way in teaching most of the texts. NAAC (National Assessment and Accreditation Council) places a priority on student satisfaction survey in the evaluation of the status of the higher education institution. Till now library books were the only reference works students could avail to enhance their knowledge. But now they can refer to many texts available online.

The current academic scenario sponsors a healthy atmosphere of interdisciplinarity. This ultimately makes the course interesting to the students and also makes them prepare for a job market. The papers focus on skill development of the students. They don't just get dry facts but becomes involved in this process of knowledge transaction. Interdisciplinarity is the study of disciplines which overlap or share some common features. This is the need of the hour as disciplines like English literature has openly embraced features from other disciplines whether it be other languages or other humanities subject. Interdisciplinarity engages two or more areas of knowledge or study. It abolishes traditional differences between two disciplines. This helps to enrich the discipline itself and also erases the gaps in understanding or elucidation.

English research is not confined to this discipline only but nowadays extends to other disciplines like History, Political Science, Sociology, other languages or even the history of sciences. Students will be exposed to such future tendencies from their undergraduate level.

ICT is Information and Communication Technology in education. Such mode is used to develop and enhance and impart the information to the students. The current syllabus provides several options to impart the traditional knowledge through the use of ICT. Now I will discuss the several types of ICTs which can be used in this curriculum and their basic differences, advantages and disadvantages with the earlier modes of teaching.

Various types of ICT

Radio and television are already been used in India since the

1920s. They are a source of non-formal ways of imparting education. The education policy makers and planners in our country have updated the current syllabus where several types of ICTs can be used. As teachers we are free to accommodate such modes in our regular way of teaching in our institutions. In my student years during the period 2004 to 2007 (undergrad) and 2007 to 2009 (postgraduate), I felt a gradual overleaping in the use of internet. I was exposed to this increased use of internet materials in our interpretation and understanding of literature texts. In my school days we were introduced to this new subject called Computer Science from class five onwards and our teachers told us that the future will be the age of computers. My teachers at Jadavpur University encouraged us to use of different online journals like Jstor, Oxford and Cambridge journals. These journals helped me a lot as a student and opened my universe of learning. These journals are a necessary part of digital library in all institutions and highly recommended by all the teachers. Nowadays reading only the text will not be enough but supplementing that traditional knowledge with the global research work on those texts (generally found in the journals) will take the student further in his knowledge quest. Lim and Tay (2003) have brought out their classification of ICT tools which can be broadly classified as –

1. Informative tools like internet, network virtual drive, intranet system, homepage
2. Software devices like CD-ROM
3. Constructive tools like MS Word, Power Point, Front Page, Adobe Photoshop, LegoMindstorm
4. Communicative tools like email, SMs
5. Collaborative tools like discussion boards

Informative tools consist of the internet and World Wide Web which are data bases or storehouses or encyclopaedia of information. The students consider these the virtual classroom or even teachers. The current syllabus has several assignments along with regular examinations for which the student can refer to the internet databases. Even if the student misses any class he or she can

keep himself/herself upgraded through the use of internet.

Software devices like CD-ROM provide hypermedia applications to the teacher and provide access to multiple media like text, audio, graphic images, animation and video clips. If these devices are made an integral part of teaching then the teachers can store them for future use and update them for further use. Nowadays teachers can also share such media files through email and whatsapp. The students can easily pass them to their friends through the option of sharing. These tools enhance the thinking capacity of students and broaden their information.

Constructive tools almost replace the chalk and board method of teaching. These tools mostly help the students in visualising information and thus forming their own understanding of the subjects. The students can also get an early idea of forming their own power point presentation in future. Microsoft word helps the student to correct their grammar and spelling errors and also sometimes the sentence constructions. In this manner the student can modify his writing even in the absence of the continuous supervision of the teacher (which is not always possible). The student can also access the Microsoft Excel to include data and tabulation in their writing.

Communicative tools are also very essential parts of education where the students and teachers can reach out to each other beyond the boundary of the classroom and institution. The students can mail or sms their queries to their subject teachers after the delivery of classroom lecture. The teacher also gets a feedback of how the lecture has affected the students, how much the students have gathered from the class lectures, what they find lacking and what are their queries. These tools make the students more involved as they have to pay close attention in the class in order to make such comments. The thinking process of the students is encouraged even after the class.

Collaborative tools can be virtual collective participation of all stakeholders in the electronic medium. This tool is very popular among teachers who can arrange for collaborative classrooms

in two different institutions at the same time. Students of two different institutions can interact with each other. They also gain access to more than one teacher in the same field. Institutions can also arrange meetings between them and thus share information and thus promote a healthy sharing atmosphere. Such collaboration helps in implementing multidisciplinarity at the level of different institutions.

There is a vision to introduce multidisciplinarity at the institutional level –

"By 2040, all higher education institutions (HEIs) shall aim to become multidisciplinary institutions and shall aim to have larger student enrolments preferably in the thousands, for optimal use of infrastructure and resources, and for the creation of vibrant multidisciplinary communities. Since this process will take time, all HEIs will firstly plan to become multidisciplinary by 2030, and then gradually increase student strength to the desired levels." (NEP 35)

NEP also stresses a more inclusive education where learners with disabilities or learning disabilities should be made more inclusive to the system. Such a holistic system of learning atmosphere is needed for this education policy to mature and generations of learners to benefit from it.

Works Cited

Ministry of Human Resource Development, National Education Policy, 2020.

Unveiling the Layers of Knowledge: A Critical Assessment of Locke's Epistemology

Biswajit Pasman

Abstract:
John Locke's epistemological framework has been a cornerstone of modern philosophy, shaping the understanding of knowledge and its acquisition. This research paper critically assesses Locke's epistemology by unveiling the layers of knowledge as conceptualized by the influential philosopher. The paper provides an in-depth analysis of Locke's theories of perception, primary and secondary qualities, and the role of experience and reason in the formation of knowledge.Drawing upon Locke's major works, including "An Essay Concerning Human Understanding," the paper examines the key components of his epistemological framework and evaluates their implications for contemporary understanding of knowledge. Special attention is given to Locke's views on innate ideas, the nature of the mind, and the limits of human understanding. Furthermore, the paper explores the relevance of Locke's epistemology in the context of modern philosophical discourse and its potential contributions to current debates on the nature of knowledge and cognition.Employing a critical lens, the paper engages with both supportive and opposing scholarly interpretations of Locke's epistemology, offering a nuanced evaluation of its strengths and limitations. By critically evaluating Locke's conceptualization of knowledge, the paper aims to contribute to a deeper understanding of the historical development of epistemological thought and its enduring impact on contemporary philosophical inquiries.Ultimately, this research paper seeks to shed light on the intricacies of Locke's epistemology, offering a comprehensive and critical assessment that enriches scholarly discourse on the nature and foundations of knowledge.

Keywords:Epistemology, Knowledge, Ideas, Experience, Mind. While the concept of empiricism predates theory, it was

not until the seventeenth century that it gained traction as a way of thinking within the Christian tradition. The only time it was briefly used was by the early Greek critics (Brightman, 1954). Before the modern era came to a close, many prominent thinkers had begun to use the empiricist approach to philosophical study. The contributions of great thinkers like Locke (1632–704), Berkeley (1685–1753), and Hume (1711–1779) in the 17th and 18th centuries helped to solidify empiricism as a lively and optimistic school of philosophy. Empiricism is a school of epistemology that rejects the idea of intrinsic concepts in favor of an exclusive emphasis on empirical data and first-hand experience. Reason is just as credible as realism when it comes to gathering facts. The first publication to present the empiricism technique of thinking was John Locke's lengthy An Essay Concerning Human Understanding. The man's reputation is best preserved in this, his magnum opus, as Bertrand Russell put it (1945). In it, Locke stated his belief that the most important way to learn is through personal experience. This essay examines John Locke's empiricism in great detail. When it comes to philosophical perspectives, empiricists hold that all ideas originate from experience, that all concepts relate to or pertain to experience, and that all generally accepted beliefs or recommendations are either correct or understandable due to their foundation in experience alone. What the Greek word empeiria (meaning experience) deduces from the English word empiricism is congruent with this interpretation. All of human knowledge is derived from direct sensory experience, according to a philosophical principle. Similarly, it casts doubt on the usefulness of derived reasoning in data processing and social interactions.

Experience, say empiricists, displays characteristics of informational laws, and one can use these models to measure the breadth of human understanding in this way. They stress that our senses are the principal means by which we collect information and ascertain reality, and that these perceptions are the foundation upon which our comprehension of the cosmos rests. That is why it is reasonable to treat as suspect, erroneous, or even bizarre any

conclusion or opinion that is not borne up by evidence. In their philosophical theories and common sense, empiricists primarily refer to experiences that arise from the activation of receptors, or at the very least, from sensory input pertaining to sight, hearing, touch, smell, and taste. All ideas, facts, and logical speculations are reduced to emotions and epiphanies, according to Hospers (1967), who lent credence to this claim. Essentially, all empiricists deny the existence of intrinsic theories and maintain that our whole body of knowledge is based on our senses and the judgments we make about them. Everyone follows the premise that when we are born, our minds are empty (Omoregbe, 1998).Based on what has been said, it seems that empiricism holds that our senses, particularly our intuition and experience, are the best tools for gaining knowledge about the world (Hossain, 2014). Most people take an observational stance consistent with the presence of mind perspective, which holds that our faculties do, in fact, supply us with knowledge of a specific type. Just 72 years after his birth in 1632 at Wrington, Somerset, John Locke died in 1704. In the seventeenth century, he was highly regarded as a leading political thinker and theorist. He is widely considered the progenitor of the school of thought known as British empiricism and made significant contributions to the present-day notions of limited liberal governance.

In his magnum opus, Essay Concerning Human Understanding, Locke aimed to provide an examination of the brain's knowledge-gathering processes. In this essay, I will mostly be evaluating human comprehension and doing an examination into knowledge. He laid up the empiricist view, which states that we pick up concepts from our environment. What we mean by "information" at that point is a specific type of interaction between concepts. Book IV of Locke's Essay begins with his statement, …knowledge then seems to me to be nothing but the perception of the connexion and agreement, or disagreement and repugnancy of any of our ideas. Where this perception is, there is knowledge, and where it is not, there, though we may fancy, guess, or believe, yet

we always come short of knowledge (4.2.2, 525).

How exactly do the terms "association and understanding" and "conflict and repugnancy" apply to our ideas in this context? One such use is a model. Extrapolate your ideas about light and dark. According to Locke, this will quickly reveal their differences or cause them to "clash." White is not black; you will know this when you see this inconsistency. This kind of arrangement or discord of ideas can happen along three distinct axes. To start, we can check if two ideas are completely interchangeable. Understanding that pleasantness isn't sharpness, for example, requires realizing that pleasantness and harshness aren't synonymous. Second, we can watch as relationships are formed between ideas. By comparing the relative sizes of the two concepts, one might deduce that seven is more important than three. Third, we can figure out when an item's concept lines up with a component's concept. For example, when I realize that ice is cold, it's because I've realized that my idea of cold is usually in line with how I feel when I touch ice. This proves that Locke thought these kinds of disputes or agreements held all of our knowledge.Since it is clear that Locke will assert that all conceptions originate as issues of fact, he should reject the theory of nature.

An examination of nativism, the view that certain views are inherent to human nature rather than learned through experience, is the first of the four books that make up the Essay. He adheres to the older schools of thought that hold that certain notions are certain and cannot be learned from experience or evolved from ideas learned from experience; these schools of thought include Descartes' and Plato's. One common line of reasoning in favor of inherent standards is the idea that humans are born with a set of predetermined moral principles already inscribed on their brains and spirits. The general public tends to agree on a small set of standards. Because there is no universally agreed-upon standard, Locke rebels against it. He contends that the fact that these views are not universally held proves they are not inherent to human nature but rather formed through time. Furthermore, if there was

any such thing as a full understanding, it could have been conceivable to arrive at this understanding by means other than intrinsic knowledge. His second point against intrinsic notions is that individuals can't have standards, even the most fundamental ones, unless you explain them to them or make sure they think about them thoroughly. The fact that people's moral views vary substantially is another reason why moral knowledge shouldn't be intrinsic.According to Locke, there are no such things as naturally separated concepts and no such thing as innate human norms. Locke argues primarily that not all supposedly innate personality qualities are actually shared by all humans. According to Locke, teaching intrinsic ideas was pointless as it didn't contain anything that he couldn't explain in light of his experimental record of how concepts emerged.

Ideas are central to Locke's description of the human brain and his explanation of our knowledge because, as he sees it, they are the building blocks of our psychological make-up. Concepts are the immediate objects of human understanding, argues Locke (Omoregbe, 1998). This would indicate that our subjective impressions of things are the sole data we possess at the moment. How does our mind generate ideas? To paraphrase Locke, when we look at anything, it fascinates us and makes a mental copy of itself. Our mental representations of items are facilitated by these images, which also act as agents for those objects (Omoregbe, 1998). Thus, ideas are things that exist in one's mind. Something inside of you reacts to what you see in the outside world, like an apple, according to the implications. This means that certain apples are what you visualize when you think about them. At a deeper level, ideas are mental operations. Your aim should be to be able to identify an apple without any intermediaries at all. For the human mind, ideas are a sign of being in touch with the world outside our immediate environment. Since the brain focuses solely on notions rather than the physical world, this leads us to believe in conceptions rather than reality as a whole. In his mind, he could distinguish between basic and advanced ideas.We

derive our knowledge from simple notions, which are the essential building block. The faculties passively convey these ideas to the mind. Every time we look at anything, a flood of ideas flows into our brains. Regardless, this is the situation whenever an item combines multiple characteristics. For example, a white blossom expresses purity and joy without being detached. White and delicious come to mind separately because they are both perceived by our brains through various senses, namely sight and scent. When ice's hardness and brittleness are perceived through touch, for example, two quite different properties are conveyed. In this case, our minds are able to tell the two characteristics apart because they are really separate. Since the simple ideas we are presented with address matters outside of ourselves, information is consistent with reality, says Locke.

In this sense, basic ideas come from external factors that impact our brains. So, when we engage with the world around us, basic ideas start to form in our minds. During their gathering, we remain still. One of the most basic principles of Locke's empiricism is this. Similar to how we recognize physical items and understand that our simplistic ideas are representations of reality, Locke admits that there are things in the world.But rather than being absorbed dormantly, our minds construct intricate notions from a hodgepodge of simpler ones. Innovative and not referencing anything specific that currently exists, complex ideas are the opposite of simple thoughts. The human brain is the creator of them. This exemplifies the three-structured mental activity. The brain does three things: (1) integrates thoughts, (2) keeps them distinct while holding them together, and (3) digests them. So, my brain combines the simple ideas of whiteness, hardness, and pleasantness to form the complicated notion of a lump of sugar. My brain combines concepts while keeping them apart to study connections when I state that the grass is greener than the tree. My mind is finally freeing ideas "from any lingering concepts that go with them in their true presence" when I disentangle the idea of man from John and Peter. So Following his definition of the

many kinds of links between ideas that constitute information, Locke proceeds to examine the three "degrees" of information in passage 4.2. Emerging fields of knowledge seem to be a component of these degrees. Natural information is the fundamental level that Locke uses. This, Locke argues, is the highest and most certain degree of knowing there is, …such kind of truths, the mind perceives at the first sight of the Ideas together, by bare Intuition, without the intervention of any other Idea; and this kind of knowledge is the clearest, and most certain, that humane frailty is capable of (4.2.1, 531).

A specialist has access to natural information when he can directly perceive the connection between two concepts. A delegate is not needed for its acquisition; it is obtained immediately. This kind of information includes numerical data, for instance. Statistical evidence follows. This information is based on reason and was uncovered via research and demonstration. For example, most of us can't tell from a glance that the three interior points of a triangle are equal to the two right angles. Nonetheless, most of us can be convinced—with the help of a math teacher—that they are similar by mathematical proof or demonstration. Here is a demonstration of some facts.The third and last level of data consists of sensitive information. It is the sensory-perceived knowledge of certain objects in their true form. Contentious data concerns the nature of the connection between our thoughts and the real-world items that inspire them. If we look at an orange, for instance, we may be sure that it is an external object in the world that is responsible for our emotions, according to Locke. One of the points that Locke makes is that there is a subjective distinction between actually biting into an orange and merely remembering doing so. Consequently, we can be certain that there is an external, analogous object because of something in our prior phenomenological experience. Here is a brief summary of the three tiers of data: It is by delicate knowledge that we know other people and things to be exactly as we perceive them, through demonstrative knowledge that we know God exists, and through intuitive knowledge that we

know ourselves to be real.

Furthermore, according to Locke, the traits that captivate us when we look at objects are what really remain after we turn away, leaving only copies or pictures of them. We are aware, however, that these attributes are inseparable. Their genesis and stability are both provided by a solid basis. What Locke means by "substance" is the foundation upon which they grow, stand, and inherit. We will never have a thorough understanding of it as our minds can never have a direct link to it. Its resulting characteristics fascinate us, and we can make sense of them. Its existence may only be inferred, since we know that certain features cannot exist in a vacuum. In order for them to be real, they should have some sort of foundation. According to Locke's central thesis, we will never have knowledge of things in their inherent qualities. Everyone knows how we feel about them. In order to provide a more comprehensive description of the process by which humans generate ideas, Locke zeroed in on the subject of the relationship between thoughts and the things that constitute them. Is our perception of reality same to our thoughts? For example, when we imagine an inflatable, what is the connection between the mental images it conjures up and the real thing? We have ideas like spherical, hard, white, and cold. An object's quality, in Locke's view, is its ability to inspire any conception in our minds, and this quality might reflect numerous concepts. We can then draw inspiration from the inflatable's attributes. Locke made a clear distinction between two types of qualities in order to go deeper into the question of the relationship between concepts and objects. These traits, he says, are both necessary and optional.

Even when a body changes, its basic attributes stay put since they are indistinguishable from the body. Characteristics such as size, shape, mobility, portability, and quantity are only a few examples. Locke argues that these physical features are the earliest and most basic building blocks of our basic mental concepts. Their appearance is similar to that of the entity itself, and there are physical embodiments of them. Inflatables, for example, look

round and are round; they move around and do move. Therefore, it would appear that our beliefs, which are based on basic attributes, are exactly those traits that mesh well with the text. Since they exist in the bodies independently of external perception, these characteristics can be considered real. But the real goods don't have any ancillary features. They offer us ideas that don't have an article that fits them perfectly. The color red pops into our heads the moment we lay eyes on the inflatable. The inflatable, though, is not red. One of the things the inflatable may do is make us think of the color red more often. It is completely unlike the body in which evident optional traits exist. When we picture a white rose, for example, it doesn't look anything like a real rose. The most striking similarity between our sense of white and the image of white that the rose can plant in our minds is the effect that its impalpable particles have on our sight. Thus, necessary attributes include development, size, shape, motion or relaxation, and quantity, or attributes that are appropriate to the object. Taste, music, and color are all subjective experiences that have no business being a part of or belonging to a body unless they are external factors that cause people to think about them. Locke distinguished between essential and optional elements to differentiate between appearance and reality, which is a crucial distinction.

Finally, this research paper's critical evaluation of John Locke's epistemology shows how intricate and important his philosophical contributions to our understanding of knowledge are. We have learned a great deal about the complexities of human vision, ideas, and knowledge generation from one of the most important individuals in contemporary philosophy by peeling back the layers of his epistemological framework, which Locke laid out. By delving into Locke's theories on perception, primary and secondary qualities, and the relationship between experience and reason, we have discovered the extent and variety of his explorations into the nature of knowledge. The continued significance of Locke's work in molding our comprehension of knowledge and cognition has been highlighted by critical assessments of his

views on inherent ideas, the limits of human understanding, and the consequences of his epistemology for modern philosophical debate. Engaging with various academic readings of Locke's epistemology has also helped us better comprehend the contentious and long-lasting effects of his philosophical legacy. This research paper has helped us better understand the evolution of epistemological thought and its relevance to modern philosophical questions by providing a critical evaluation of Locke's epistemology that takes into account its strengths and weaknesses. As we wrap up this critical evaluation, it is clear that John Locke's epistemology is still a hot topic among scholars, making us think deeply about the basics of knowing. We have both deepened our knowledge of Locke's intellectual achievements and added to the continuing conversation about the intricacies of human thinking and the continued relevance of philosophical investigation into the past by peeling back the layers of his epistemology. In the end, this critical evaluation proves that Locke's epistemology has had a lasting impact on the development of philosophical thought.

Bibliography:

• Brightman, S. B. (1954).A Philosophy of Religion, New York: Prentice Hall.

• Copleston, F. (2003).A History of Philosophy: British Philosophy Hobbes to Hume, Vol. 5. London: Continuum.

• Edwards, P. (ed.) (1967).The Encyclopaedia of Philosophy,New York: The Macmillan Company.

• Hospers, J. (1967).An Introduction to Philosophical Analysis,London: Printing Hall.

• Locke, J. (1959).An Essay Concerning Human Understanding, Vol. II. New York: Dover Publications.

• Omoregbe, J. (1998).Epistemology: A Systematic and Historical Study,Lagos: Joja Educational Research and Publishers Ltd.

• Russell, B. (1945).A History of Western Philosophy, New York: Simon and Schuster.

•Stumpf, S.E and Fieser, J. (2015).Philosophy: A Historical Survey with Essential Readings, New York: McGraw-Hill Education.

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় স্বপ্ন এবং বাস্তবতা

বিশ্বজিৎ কর্মকার

শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকঃ

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত বিদ্যালয়কে কারাগারের সাথে তুলনা করেছিলেন। তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন শিক্ষার নামে কঠিন শাস্তি বা পিড়নে। শিশুর আত্ম সম্মান বোধকে মর্যাদা দেওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই বেছেছেন। বর্তমান সময়ে এসে আমাদের সেই কথাটি যেন আরও বেশি করে ভাবিয়ে তুলছে। ছাত্রদের মধ্যে স্বশাসনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তিনি প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে এক জন 'কাপ্তেন'-এর প্রচলন করেছিলেন। তবে প্রমথনাথ বিশীর লেখা থেকে জানতে পারি, সব ছেলেরা তাদের কাপ্তেনকে মান্য করতো তা নয়। আবার অনেক সময় কাপ্তেনরাও নিয়ম ভঙ্গ করতো। শান্তিনিকেতনের ছাত্র মানেই যে খুব ভালো তা নয়। শিক্ষক জগদানন্দ রাগ করে কখনো বলতেন, 'বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো' ছেলে।১ এমনকি ছাত্ররা মারও খেত মাঝে মধ্যে। জগদানন্দের চপেটাঘাত নিয়ে ছড়া লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে জীবনযাত্রর মান খুব আড়ম্বর পূর্ণ ছিল না, খাবারও ছিল সাধারণ মানের। সেই সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী জানিয়েছেন, 'ছাত্ররা পুরনো কাপড়ের বিনিময়ে সাঁওতালদের কাছ থেকে ডিম কিনে অমলেট ভেজে খাওয়ার সাহসও দেখিয়েছে'।২ নন্দলাল বসু এলমহার্স্টকে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের সম্পর্কে বলেছিলেন, ওরাই হলো 'সবচেয়ে বড়ো উৎপাতের'।৩

এই সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মধ্যে ব্যথিত করে তুলেছিল। এমনকি ছাত্রীদের পোশাকের শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এই অভিযোগও তাকে শুনতে হইয়েছিল। দীনেন্দ্র সেনের মতো অভিভাবকও রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছিলেন। একবার এক ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাধতে শুরু করেছিল। এতে রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, এমন শিক্ষক আশ্রমে না থাকাই ভালো। আর ছাত্রদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তোরা কি মনে করেছিস তোদের বিশ্রী আচরণকেও সহ্য করবো?'৪ আরেক বার এক জন শিক্ষক এক ছাত্রকে তিরস্কার করলে ছাত্রটির পক্ষ নিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ওই শিক্ষককে দু একটা কটু কথা পর্যন্ত শুনিয়ে ছিলেন। এই ঘটনা নিয়ে শান্তিনিকেতনে অশান্তি হয়েছিল। এই প্রকার নানা রকম অপ্রীতিকর

ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মধ্যেই অস্থির করে তুলতো।

শিক্ষকেরাও যে পারস্পরিক মতান্তর বা মনান্তর থেকে মুক্ত ছিলেন তা নয়। লীলা মজুমদার তার 'আর কোনখানে' গ্রন্থে সেই সব বিস্তারিত ভাবে বর্ণানা করেছেন। তিনি যে পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন তাকে তাকে খুব যে প্রীতিপূর্ণ বলা যায় তা নয়। শিক্ষকেরা যে সকলেই একই রকম আদর্শ অনুসরণ করে চলতো তাও নয়। ১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি শিক্ষকদের অনুরোধ করেছিলেন, পাচককে তারা যেন ছুটি দিয়ে তারা নিজেরাই ছাত্রদের সাথে রান্নার কাজটি করেন।[৫] নেপালচন্দ্র রায়, পিয়ারসন এবং আরও কয়েক জন খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ছাত্ররাও উৎসাহ পেয়েছিল রান্নার কাজে। কিন্তু কিছু শিক্ষকের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত সেই সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি ফিরে এসে সব কিছু শুনলেন। তিনি রান্নার কাজে উৎসাহ দেখাননি। তিনি চাননি রান্নার কাজে ছেলেদের লেখা পড়ার ক্ষতি হোক।

কয়েক জন শিক্ষক মিলে ঠিক করলেন, এক শূদ্রকে দিয়ে রান্নার কাজ করাবেন। এই মতে বিধূশেখর শাস্ত্রী রাজি হননি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'অস্পৃশ্য জাতির' এক বালকের স্পর্শে অন্নব্যঞ্জন একদিন 'দূষিত' হয়ে যাওয়ায় আর তা খাওয়া হয়নি।[৬] মুসলমান ছাত্র শান্তিনিকেতনে ভর্তি করা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম থেকেই আগ্রহ ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে কোন কোন শিক্ষকের আপত্তি ছিল। এই বিষয়ে বরীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল'।[৭] যদিও অনেক পরে ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের প্রথম মুসলমান ছাত্র হলেন, সৈয়দ মুজতদা আলী।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন ১৯০৫ সালে, আমরা নৃতত্ত্বের গ্রন্থ পাঠ করি। কিন্তু ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম-বাগদি-কৈবর্তরা আছে তাদের সম্পর্কে 'লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না'। এখানেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার যথার্থতা। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে গ্রামের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। পল্লি সেবার আদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ছাত্রদের মাঝে মধ্যে ভুবন ডাঙা এবং সুরুল গ্রামে নিয়ে যেতেন শিক্ষক কালীমোহন ঘোষ। যদিও ১৯১৯-১৯২০ সালের আগে ছাত্রদের সঙ্গে গ্রামের কোন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ওই সময় থেকে দেখা যায়, কালীমোহন নেতৃত্বে ছাত্ররা পৌষমেলায় স্বাস্থ্য চেতনার শিবিড় গড়ে

তুলছে। এবং কেন্দুলির মেলায় ম্যালেরিয়া এবং বসন্ত রোগের উপর স্লাইড প্রদর্শন করছেন। ১৯১৯ সালে পৌষ মেলায় সেই সময় বীরভূমের জেলা শাসক গুরুসদয় দত্ত পল্লিজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তারপর কয়েক জন কৃষক তার সঙ্গে সেই বিষয়ে মন খুলে আলাপ করে ছিলেন।[৮] শান্তিনিকেতন আশ্রম সংলগ্ন সাঁওতালদের গ্রামে পিয়রসন 'সুহৃদ বিদ্যালয়' নামে একটা নৈশ বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। কিছুদিন পড়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভুবনডাঙার গ্রামে আরেকটি স্কুল তৈরি করেছিলেন। পিয়রসন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিয়ে সেই স্কুল গুলিতে যেতেন গ্রামবাসীদের পড়ানোর জন্য।

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথঃ

১৯১৮ সাল থেকে নিজেও শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ে অনেক সময় দিচ্ছিলেন। এই সময় রানু অধিকারীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন সেই সময়ের কথা। প্রতিদিন সকালে তিনি ছেলেদের পড়াতেন এবং সন্ধ্যার সময় 'পরদিনের পাঠ' তৈরি করে রাখতেন। ছেলেরা তাঁর ক্লাসটাকে খেলা মনে করতেন। আর রবীন্দ্রনাথকে মনে করতেন তাদের 'খেলার সঙ্গী'। সৈয়দ মুজতবা আলী সে দিনের কথা স্মরণ করে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' পড়ানোর আগে নোট তৈরি করে নিয়ে আসতেন।[৯] ঠিক ওই সময়ে কতকগুলি কারণে বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। অভিভাবকদের চাপে এবং বাস্তব প্রয়োজনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম গ্রহণ করতে হয়েছিল ১৯১৮ সালে। এর আগে দু বছর শুধু ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠক্রম অনুসারে পড়ানো হত। পরীক্ষার্থী হিসাবে ছাত্ররা জেলা স্কুল থেকে পরীক্ষা দিত। রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য পাঠের জন্য তাঁর বিদ্যালয় স্থাপন করেননি। তিনি মহৎভাব, বিশ্বপ্রকৃতি ইত্যাদি যে বিভিন্ন আদর্শ নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তা আমাদের দেশে ছিল প্রথম ভাবনা। ১৯১৭ সালে কলকাতায় একটি ভাষণে তিনি তার শিক্ষা ভাবনার কথা বলেছেন, 'যে রাজস্ব হইতে আমাদের উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার বেশির ভাগ অর্থ আমাদের ঐ অশিক্ষিত কৃষকেরাই যোগাইতেছে; তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য'।[১০] ১৯১৯ সালে যখন বিশ্বভারতী হল, তিনি তার এই শিক্ষা চিন্তা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করলেন, 'যেখানে চাষ হইতেছে কলুর ঘানি ও কুমোরের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শ পৌঁছায় নাই।[১১] এর দু বছর পরে আমেরিকাতে চিঠি লিখলেন এলমহার্স্টকে, গ্রামগুলো মুমূর্ষ শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। তাই তিনি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবছেন যার শক্তিতে কৃষকেরা স্ব-উদ্যোগে মৃত গ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এমন একটি বিদ্যালয়

চেয়েছিলেন, যা 'সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে' পল্লিজীবনে প্রয়োগ করে 'দেশের জীবনযাত্রায় কেন্দ্রস্থান' অধিকার করবে। তিনি বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন বিশ্বভারতীকে দিয়ে সে কাজ সহজ নয়। তাই তিনি বিশ্বভারতীর তিন বছরের মধ্যেই ১৯২২ সালে স্থাপন করলেন তাঁর শিক্ষাধারার অভিনব প্রয়োগ ক্ষেত্র শ্রীনিকেতন। নতুন বিদ্যালয় 'শিক্ষাসত্র'১৯২৪ সালে ।

শিক্ষা চিন্তাঃ

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। আর ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে গড়ে ওঠে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়, 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। শিক্ষা নিয়ে তিনি নানা রকম ভেবে যাচ্ছেন তার প্রমাণ মেলে, ১৮৯৮-৯৯ নাগাদ শিলাইদহে নিজের সন্তানদের জন্যে তিনি একটি গৃহ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কবি পুত্র সহ আরো চার জন যোগ দিলেন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের আগে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'-তে দু একবার শিক্ষা চিন্তার কথা পাওয়া যায়। তার আপত্তি মূলত ইংরেজি মাধ্যেমের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন এই ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা 'কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না'। তিনি চেয়েছিলেন মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি শিক্ষা চিন্তা স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করলেন, তিনি মনে করেন, এই 'শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই', এই শিক্ষা 'জীবনের সহিত অসংলগ্ন', 'আমরা বাল্য হইতে কৈশোরে এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া'।[১২] ১৮৯৪ সালে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন, 'যে শিক্ষায় মানুষের মনকে সচেতন করে দেয়, বিশ্বসংসারকে নানাভাবে অনুভব করবার শক্তি সঞ্চার করে, সেইটেই হচ্ছে মানুষের পক্ষে খুব একটা মূল্যবান শিক্ষা।[১৩] আবার ১৮৯৮ সালে ভারতী পত্রিকায় দুঃখ করে লিখলেন, 'বিদ্যালয়ে আমরা যাহা লাভকরি, সমাজে তাহার কোন চর্চা নাই।... বিদ্যা আমাদের প্রাণের সহিত, রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় না'।[১৪] রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শ শিক্ষা প্রণালী কি তার একটা আভাস তিনি ১৮৯২ সালে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, 'অত্যাবশ্যক শিক্ষা'র সাথে 'স্বাধীন পাঠ' মিশিয়ে দিতে হবে। তাতে শিক্ষার্থীর 'গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে' বিকাশ লাভ করতে পারে। ভাষা শিক্ষা ও ভাব শিক্ষা সম্পর্কে লিখলেন, 'সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য' হতে পারে। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় শুরু করবার কিছু আগে তিনি জানিয়ে ছিলেন, 'যাহাতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের বুদ্ধি, শরীর ও চরিত্রের

উন্নতি হয় সেজন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইব'। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে 'ব্যায়ামচর্চার যথেষ্ট আয়োজন' থাকবে বলেও জানিয়েছিলেন।[১৫]

এই চিন্তাকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম বা বিদ্যালয় সূচনা করলেন পাঁচজন ছাত্রকে নিয়ে। এবং তিনজন শিক্ষককে নিয়ে। উদ্বোধনের দিনে ছাত্রেদের দীক্ষা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছাত্রদের প্রাচীন বৈদিক আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না... সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন, এইটে নিশ্চয় জেনে, আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে'। প্রাচীন তপোবনের আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রুশো যেমন প্রকৃতির জীবনকে আদর্শ মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথও তেমনি মনে করতেন, 'বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে' এক 'আবারিত যোগ' করে দেয় প্রকৃতি। তিনি মনে করতেন, 'আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে' ওঠা।[১৬] রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষার মধ্যেদিয়ে স্বদেশ সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি বোধ জাগিয়ে তোলা। আশ্রমের উদ্বোধনী ভাষণের তাঁর প্রথম বাক্যটি হল, 'অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল—তখন এখনকার লোকেরা বীর ছিলেন'। প্রাচীন ভারতের চিন্তা ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে। তিনি তখন বর্ণাশ্রমে আস্থা রাখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'ভারতবর্ষীয় প্রণালীই' শ্রেষ্ঠ। ধর্মকে মনে করতেন মানব সভ্যতার আদর্শ, 'ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে'।[১৭] যদিও তিনি জানতেন, তপোবনের আদ্ররস একটা 'পুরাণকথা', তবু তিনি সেই পুরাণকথাকে আশ্রয় করেই স্বদেশের একটা মূর্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ে। শিক্ষা চিন্তার ইতিহাসে দেখা যায়, দার্শনিকেরা তাঁদের নিজেদের দর্শনের উপর নির্ভরকরেই শিক্ষা চিন্তার কথা বলেছেন। যেমন, ফ্রোয়েবল শিক্ষা প্রস্তাবে ধর্ম শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম শিক্ষা শিশু মনে 'মহাজাগতিক ঐক্যের' ধারণা সঞ্চার করবে।[১৮] রবীন্দ্রনাথও তাঁর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বিদ্যালয়ে। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির চেতনা স্থাপন করতে চেয়েছে তাঁর শিক্ষা চিন্তায়। তিনি, 'ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ' খুঁজেছেন প্রকৃতির মধ্যে।[১৯]

ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার বিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষত স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে। ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় স্ব-উদ্যোগ এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছেন। যদিও তপোবন ভাবনার থেকে তখনও সরে আসতে পারেননি। ১৯১২ সালে জগদনন্দ

রায়কে লিখে ছিলেন, 'ছেলেদের মন যাতে মুক্ত জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে... এইটে আমি একান্ত মনে কামনা করি'।[২০] রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর আদর্শ বিদ্যালয় হবে, 'নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে, গাছপালার মধ্যে', আর শিক্ষার লক্ষ্য হবে, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ'। সেখানে শুধুই ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা হবে না, হবে, 'বোধের শিক্ষা'।[২১]

স্বপ্ন এবং বাস্তবতাঃ

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯০১ সালে। তার ২৩ বছর পর শ্রীনিকেতনে গড়ে তুললেন 'শিক্ষাসত্র' নামে আরেকটি নতুন বিদ্যালয়। তাঁর আদর্শ ব্যর্থ হচ্ছিল তাঁরই শান্তিনিকেতনে। তিনি ১৯৩০ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বললেন, 'ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকা নির্বাহের জন্য পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রি নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই আমি আরেকটি স্কুল খুলি। ... এই অপর স্কুলটিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, তা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি। ... অনতিকাল পরে এই গ্রামের ইস্কুলটিই সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠবে, অন্যটি তখন পাবে অবহেলা'।[২২] যে আদর্শ নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে তিনি সরে এলেন। ১৯৩৭ সালে এলমহার্স্টকে একটি চিঠিতে সে কথাই যেন স্পষ্ট করে বললেন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় থেকে তিনি শ্রীনিকেতনের 'শিক্ষাসত্র'কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, শান্তিনিকেতন একটা গতানুগতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছিল। সেখানে শিশুদের মনকে খাঁচায় পুরে দেওয়া হচ্ছিল। তিনি লিখে ছিলেন, 'I myself attach much more significance to the educational possibilities of Siksha-satra than to the school and college at Santiniketan.'[২৩] জীবনের শেষ পর্বে তিনি শ্রীনিকেতনকেই যেন তাঁর শিক্ষা ভাবনার কেন্দ্র বলে মনে করলেন। ১৯৩৯ সালে শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় তিনি বললেন, 'খোলা গ্রামকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করতে হবে—সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা-কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক'খানা গ্রামকে এই ভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলবো, এই ক'খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ'।[২৪]

ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। আমাদের দেশের অর্থনীতি একেবারে তলানিতে এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্তিম দিনে পৌঁছে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে

শ্রীনিকেতন নানা ভাবে বিকৃত ও রূপান্তর হয়ে গেছে। শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্র আদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে অন্য বিদ্যালয়ে মত পর্যবশিত হয়েছিল। শিক্ষাসত্রের শিক্ষা ছাত্ররাও স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারছিল না। একবার এক ছাত্র চামড়ার কাজ শিখেছিল। কিন্তু 'মুচির কাজকে' জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেনা, তাই তার মায়ের নিষেধে সেই বিদ্যা শেখা বন্ধ করেছিল।[২৫] শ্রীনিকেতনের ভিতর ও বাইরের পরিবেশ যে খুব অনুকূল ছিল তা নয়। ১৯৪০ সালের পর থেকেই গ্রামের সঙ্গে সংযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। গ্রামের মানুষদের দাবি ছিল, তাদের সন্তানদের সরকারি পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দিতে হবে। এই বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল মাত্র ছ'টি ছাত্র নিয়ে। ১৯২৯ সালে তিরিশের কাছে পৌঁছে ছিল। ১৯৪৯ সালে আবার তা নেমে ২১ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মনে করেছিলেন, 'গ্রামের লোকে এসব চায় না'। তাই পাঠভবনের শিক্ষাক্রমই শিক্ষাসত্রে চালু করা হয়েছিল। পরিচালকরাও শিক্ষাসত্রকে একটা গড়পড়তা স্কুল হিসেবে দেখতে শুরু করে ছিলেন।[২৬]

রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালে শিক্ষা নিয়ে যা ভেবেছিলেন তা ১৯৫০এ সার্বিক ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিলা না ঠিকই। তবে তাঁর নির্যাসটুকু নিয়ে সময়ের চাহিদার সাথে মিলিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করার সুযোগ ছিল। স্বাধীনতার পর রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণকরে ঔপনিবেশিক শিক্ষার কাঠামো কিছুটা হলেও পরিবর্তন করার সুযোগ আমাদের হাতে এসেছিল। আমরা তার কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছি। আর আমরা কতটা নষ্ট করেছি সে কথা সময় বলবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ১৯৬৫।

২। প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ১৯৬৫।

৩। L.K.Elmhirst—Poet And Plowman, Pioneer in Education1975.

৪। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—শান্তিনিকেতনের স্মৃতি, দ্র. রবীন্দ্রস্মৃতি, সম্পাদনাঃ বিশ্বনাথ দে, ক্যালকাটা বুক হাউস ১৯৬১।

৫। M.K.Gandhi—Autobiography, OM Publishing 2010.

৬। পঞ্চানন মণ্ডল—ভারতশিল্পী নন্দলাল, রাঢ় গবেষণা পর্ষদ ১৯৯৩।

৭। জগদানন্দ রায়—স্মৃতি, দ্র. আর কোন খানে, মিত্র ও ঘোষ ১৩৯১।

৮। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৯৩৫

৯। সৈয়দ মুজতবা আলী—গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, মিত্র ও ঘোষ ১৯৮১।

১০। প্রবাসী, ১৩২৪

১১। রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা চিন্তা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০১৬।

১২। L.K.Elmhirst--Poet And Plowman, Visva Bharati University 1925.

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- শিক্ষার হেরফের, রবীন্দ্র রচনাবলী,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০১৬।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০১৬।

১৫। সত্যেন্দ্রনাথ রায় —সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথে, দে'জ পাবলিশিং ১৯৭২।

১৬। প্রশান্তকুমার পাল—রবিজীবনী (৫ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স ১৪২৬।

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিক্ষার মিলন, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০১৬।

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতবর্ষের ইতিহাস, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০১৬।

১৯। রবার্ট ইলিচ—হিস্টরি অফ এডুকেশনাল থট, আমেরিকান বুক কোম্পানি ১৯৫০।

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিক্ষাচিন্তা,রবীন্দ্র রচনাবলী,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০১৬।

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিক্ষাচিন্তা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০১৬।

২২। সত্যেন্দ্রনাথ রায় -- —সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথে, দে'জ পাবলিশিং ১৯৭২।

২৩। L.K.Elmhirst— Pioneer In Education, Visva Bharati University 1925.

২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০১৬।

২৫। Hasim Ali—Then and Now, Asia Publishing, 1960.

২৬। সুনীলচন্দ্র সরকার—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা, মৈত্রী ১৯৬৪।

Myth versus Reality: A Brief Assessment of Feminist Revisionist Mythology in Margaret Atwood's Select Poems from The Snake Poems Series.

Adrija Santra

Recreating and retelling of the existing texts is not only an innovative literary practice, but also an effective device to revaluate and reshape our own cultural discourses. Basically, myth belongs to high culture, but can assimilate itself to popular culture as an indispensible part of it. But, when the very domain of 'culture' is predominantly presided by one particular part of the entire human population, it is bound to be biased, discriminative, fabricated in such a way to subjugate the other section, as well as to normalize and perpetuate that imposed domination. As Alicia Ostriker makes an observation in her essay "The Thieves of Language", in mythology"we find the conquering gods and heroes, the deities of pure thought and spirituality so superior to Mother Nature; there we find the sexually wicked Venus, Circe, Pandora, Helen, Medea, Eve, and the virtuously passive Iphigenia, Alcestis, Mary, Cinderella"(71). The realm of myth is designed, proliferated and patronized by the male. Ostriker comments that mythology has always been an "inhospitable terrain" for women, where they are always projected as "either 'angel' or 'monster"(71). Women are never offered the choice of being a real human being made of flesh and blood. Mythical discourses, as well as the domain of language are always directed by a phallocentric1 worldview. Myth has always been considered as the flag bearer of a certain culture. Again the word 'culture', associated with logocentrism2 and consisted with an exclusively patriarchal connotation, is tactfully used as a tool for discrimination in gender politics. The concept of 'Nature' has been placed in opposite to the idea of 'Culture', in order to draw a sharp line between emotion and intellect, instinct and the so called 'civility'. Hereby, Nature as a mother has always been

subjected to remain a passive vessel, while God the 'creator', is designated as the omnipotent, thus to be the active one. It is quite natural that myth as a product of culture, always tends to bestow the hegemony upon patriarchy. Regardless to country, community and culture, in all kinds of myths women are subjugated, exploited, commodified or deprived in all possible ways.

And here lies an inevitable urge for revision. This is an urge for survival, a desperate attempt to resurrect one's existence, to emancipate the voice subdued for a long time, to retell the forgotten, untold stories that have been kept concealed quite strategically. A revisionist mythmaker serves a two tier purpose- first, to produce alternative perspectives that are often overlooked or ignored, second, to render a verbal articulation to those eradicated, unregarded truths; thus to make an attempt to challenge the orthodox. Revisionist mythmaking carries a profound significance in the realm of feminist literature. Contemporary women writers show a tendency to invade this apparently impregnable castle called 'myth', in order to find the root of their own selves, rebel against the long run deprivations and subjugation in a logocentric sphere of male supremacy, and make the world aware of the active participation of women in the formation of 'culture'.

Margaret Atwood is one of the most prominent contemporary writers of this genre. As critic Sharon Wilson has remarked in her study of Atwood's revisionist myth, "Atwood has used mythology in much the same way she has used other intertexts … Whether explicitly named or simply implied, Atwood's varied mythological intertexts are central to her images, characterization, and themes." (Wilson 215) Her poems are no exception. Atwood's poetry often moves beyond subjectivity and makes a quest for the "unconscious mythology" of (wo)mankind. Atwood's series of poems entitled as Snake Poems that composes the first section of her collection Interlunar, can be comprehended as an instance of her genius in breaking and making myths. Atwood encourages her readers to unlearn the conventional phallocentric myths about snakes, while associating the very idea of snake with female spir-

ituality. Where in the patriarchal myth, snake is portrayed as the seductress, the intriguer, and the transgressor, Atwood rebelliously announces that "The snake is another name of god"(95; line 1). Through acquiring a snake spirit, a woman can identify herself with the god and excel to the way of spiritual emancipation. In my paper, I would like to explore Atwood's use of feminist revisionist mythology as a tool for annihilation of the phallic symbols associated to snake, and introducing a revolutionary paradigm shift by ascribing to the snake a female spirit of its true nature. This paper will focus on three of Atwood's poems in the said series: Bad Mouth, Quattrocento and After Heraclitus.

In spite of being a prolific source of artistic and literary inspiration, snake is, in real, a menacing, ominous creature that evokes a sense of aversion, makes a cold shiver run down our spines. According to researches, the fear of snake is partially innate in human nature. The hypnotic, gruesome gaze, the haunting and repulsive appearance, the furious yet perplexing motion—all these tropes conflate to make the image of snake dreading yet fascinating, and above all, exclusively mysterious. This very awfulness associated with snake gives birth to a plenty of myths as well as prejudices that we find to be articulated in art and literature worldwide. The poem Bad Mouthopens with such a tone of fierceness. The snake here is not a calm, cold, passive seductress and shrewd artificer; rather, she is violent, rampant, indomitable, vehement like storm, inevitable like death. Puff adder, Constrictor, Pit Viper all are fierce, deadly, venomous creatures "fanged and gorge on blood"(88; line 2). For them, "killing is easy and careless as war, as digestion"(line 10-11). Apart from a few examples, snakes have hardly been associated with chaos and destruction. But, Atwood's poem takes an experimental turn by illustrating the snake as an epitome of death. The "endless gullet"(line 4) is inclined to devour the poetic hunter. The hunter is the embodiment of phallus, the hollow male vanity. To engulf the phallus "like sheer greed, lithe and devious"(line 7) is to take conquer over this hollowness, to perish the phallic pride and thus, to attain a survival strategy. In

the process of destruction, there lies a possibility of a new beginning. The snake combats with the phallocentric ideas entrenched in our cultural history and paves the way for a paradigm shift that leads to the path of emancipation. Here, the snake has been exalted to the position of a goddess.

The poetic persona fails to identify herself with the snake spirit because the snake cannot scream. This lack of comprehensible language makes the spirit impalpable, beyond human understanding. The poet recalls science fiction stories to seek some resemblance, but in vain. This apparently alien, incommunicable spirit seems to be inexplicable with logic or intellect. "One who can explain them/ can explain anything"(line 32-33). Here we can see a prominent reflection of Atwood's agnostic3 attitude. In fact, the idea of logocentrism itself is postulated to belong to the masculine domain. Phallocentrism and logocentrism are supposed to be complementary to each other. Atwood points to the sheer inefficiency of logos when it comes to penetrate the mysterious, inaccessible world where the snake inhabits. Phallocentric worldviews based on positivism, science and rationality have been turned down. Seeing is not always believing; perceiving the world with a phallocentric gaze, a mere sensual reception towards the nature, connecting to the world with a positivist approach is not only futile, but also misdirecting. Only a heart blazed with the fire of aspiration can solve the mystery of god. The path of fluidity, flexibility, spontaneity and spirituality has been encouraged by Atwood. Dewit argues, "By describing the mating rites of the snake in terms of colour, the blue-green colour of cyanide, and as inanimate objects, length of string, the speaker completely removes the image of the snake from any sexual, or even association"(18). The speaker further observes "Alone among the animals/ the snake does not sing"(89; line 41-42) The snake does not need to communicate through audible language. The poet seems to challenge the very domain of language, which is exclusively male centred. Phallocentric language system has subdued the female voice. In the realm of language, women have always felt to be alienated.

And, the snake vigorously transcends this despotic regime, and speaks the language of stars, not of human. Stars need not to flaunt themselves, they are illuminated by their own light, own resources, own exuberance.

The next poem called Quattrocento inaugurates with the description of a 14th century painting based on the creation myth about Adam and Eve. Here the snake is portrayed as a woman. "and the snake, vertical and with a head/ That's face-colored and haired like a woman's"(lines 8-9). Again, the artist is patronizing the phallic myth, by making the snake (as well as a woman) as a seducer, an ally to the sinner, and the reason behind the fall of Man. She is the perpetrator who invades to the Garden of Eden to hamper its immaculacy. But Atwood, in her very innovative manner, subverts the concept by praising this act of invasion. She argues that before the enter of the snake, the heaven was far more insipid and monotonous than the hell. She observes that there is no trace of happiness in the faces of Adam, Eve or even the zoo animals and the angels. "There's no love here/ May be it's the boredom"(lines 16-17). The apple offered by the snake propagates the possibility of life amidst this land of melancholy. The apple is a 'heart' where the seed of life is latent. But, the patriarchal myth cunningly switches the idea and accuses the snake as the reason for death and suffering, deliberately overlooking the possibilities of life, joy and love. The apple is a 'blood snowball' that is made of "death upon death squeezed together"(lines 23-24) This may be a symbolic death of this static, degenerating perpetuality that is broken into an endless flow of life. Once Eve takes a bite of the fruit of knowledge, she accomplishes a sense of self realization; and according to Atwood, to know oneself is to know the god. The mythical figure of the god, which is nothing but a boastful representation of masculine power, may accuse Eve as a sinner. But now she knows herself, she is free from the mystic idea of 'body', and becomes aware of the true nature of a body made of flesh and blood. The chest of knowledge is now accessible to her. She can

…feel the membranes of disease

Close over your head, and history
Occurs to you and space enfolds
You in its armies, in its nights, and you
Must learn to see in darkness. (lines 31-35)

God in patriarchal myth was meant to be disobeyed in order to perceive the glory of the real divine. Thus, the violation of the mythical God offers the possibility of true divine realization, the knowledge about self, the knowledge about the world, both the joyous and the disappointing ones. That is how human learns to value the light, while. And then they learn to pray to the god. So, the snake is not actually a transgressor, but itself accomplishes a state of godhood by conveying an enlightenment. The snake god utters the absolute truth "Love is choosing"(43). and Eve makes her choice. Thus, the snake becomes a goddess, and Eve turns to be her devotee. And thus human successfully gets access to the realm of god.

The next poem, After Heraclitus, remembers the doctrine of the ancient Greek pre-Socratic philosopher Heraclitus of Ephesus. One of Heraclitus' popular ideas is that fire is the Arche, or, the originator of all other elements. He believed that, the world-order, or the cosmos is created from fire, and everything will gradually return to the fire again in a process of eternal cycle. Atwood brilliantly relates this idea with the popular snake myth that depicts the snake as a representative of fertility, birth and resurrection. The skin shedding of the snake is often rendered an interpretation associated to rebirth. The everliving fire never extinguishes, so also the flow of life in the universe. And the snake is imagined as the physical manifestation of this fire power. Fire has the ability to create, sustain and perish. It shows a striking resemblance with the divine trinity in Hindu mythology, who epitomizes creation, destruction and harmony. Here, the snake, which symbolizes a feminine power, is believed as the Mother, the originator, she holds and controls the circle of birth, death and rebirth.

The snake is an incarnation of life force. She has her body, a free, floating, distinctive body that creates its own language in course

of its movement. The patriarchal language system is unable to decipher the message of this proud, spontaneous, wavy motion. So, the snake goes on creating its own language system that is approved by the Nature. The presence of the snake is a bliss, that brings light and prosperity. "…the sunlight praising it/ As it shines there on the doorstep/A green light blessing your house" (lines 11-13). Unlike the previous poem, where the speaker was conversing with a feminine spirit, here the speaker addresses a patriarchal 'you'. The speaker askes the vainglorious, egoist phallic spirit to pray to the snake goddess, to worship her, to nurture her. She can heal his soul like a mother, she can protect him from perils. She possesses the omniscient power. And the toxic masculinity is quite aware of her power. That's why it wants to suppress her, it always tends to eradicate her existence as she may cause a threat to its despotic regime. "You do not pray, but go for the shovel/ old blood on the blade (lines19-20).

To bow down means to surrender, to accept the sublimity of the goddess. But the phallic power is never ready to do that. He sees in her the bodily manifestation of "the darkness that you fear"(line 22). He deliberately turns his back from her, in spite of being haunted incessantly by its eternal presence. No name has been given to the goddess by the phallocentric language system. So, she decides that name by herself, and the name of the phallus too. As Dewit refers to TorilMoi, quoting Kramarae, "Feminists have consistently argued that "those who have the power to name the world are in a position to influence the reality"(66). This supremacy makes patriarchy feel insecure. So, it kills her to choke her voice, to prevent her from flourishing. But, the irony is that the phallus, by eliminating the identity of women, unknowingly deletes the name of itself, unconsciously loses its own relevance. A mutual symbiotic relationship between men and women is required in order to sustain the existence of both.

Throughout the entire series, Atwood never tries to completely deviate from the original mythological stories. She retains the essence, while subverting the symbolic representations. She

does not wish to escape myth. In fact, she is prepared to face it valiantly, and determined to eliminate the deconstructed, distorted parts, and extract the suppressed reality. Atwood's aim is to purify the domain of myth, which is diplomatically constructed by the patriarchal society as a tool of oppression. Any kind of myth is inevitably embedded with a certain discourse, that is consciously crafted in order to serve the hegemony. They hardly possess an authentic historical base, rather they are fabricated and formulated that tend to conceal the other side of the story. Whenever she revisits the traditional myths in her poems, it always brings a satiric tone that vehemently exposes cruel, shameless, exploitative propaganda of the patriarchal mythological system. At the same time, there is always an endeavour of resistance. She advocates not for the concocted palimpsests comprising a bunch of half truths and inherent propagandist ideologies, but for the real, spontaneous truth that is constant, evident and approved by the nature itself. Adrienne Rich desires in her poem "Diving into the Wreck" seeks to have "the wreck and not the story of the wreck / the thing itself and not the myth"(lines 60-61). But, Atwood's revisionist attitude does not actually demand a termination of myth. It may have a two tier reason, first, mythical discourses are so firmly rooted in our socio-cultural system, that it may be an imprudent approach to advocate for an immediate obliteration of it. Secondly, Atwood rather tries to take an advantage of such an entrenchment and discreetly subverts the same myths to use them against their own proponents. What Atwood does is to identify the tropes that demand amendments, reveals the truths behind them, and allows the reader to access the reality instead of some devious, misleading stories meant for indoctrination.

Atwood's image of snake in the current series transcends from femininity to divinity. If a woman is a mother, who shows her child the light of the world, the snake is similarly an emancipator, a redeemer carrying the potential to offer salvation to the entire mankind. And in return, she demands nothing but the dignity she deserves. The dignity, that the domain of myth has always

deprived her from. She can be a terrible, poisonous creature if enraged, and at the same time, an affectionate nurturer if satisfied. Also, she desires to get free from the shackle of any kind of passivity. She does not want to lie in the lines of verses as muse, but claims to be the writer of her own story. A story that will lead to the path of light, liberation and limitlessness.

Notes

1. Phallocentrism: The word was coined by Ernest Jones in 1927 as a part of Jones' disagreement with Freud over the latter's emphasis on the phallic stage in the development of a child. Phallocentrism is an ideology that proposes that the phallus, or the male sexual organ plays the central role in understanding the social world. Phallocentrism promotes an exclusively male centred worldview, where men possess all kinds of privileges, while women are subjected to live in a world of 'lack'.
2. Logocentrism: A term coined by Ludwig Klages. The term indicates to the traditional emphasise on 'logos' or western science and philosophy in shaping and analysing the socio-cultural phenomenon as well as the domain of language.
3. Agnosticism: a particular kind of belief that assumes that human knowledge is too limited to know the ultimate reality of the universe. The existence of anything beyond the palpable world-such as God, divine, supernatural is unknowable and imperceivable.

Works cited

Atwood, Margaret. "After Heraclitus." Selected Poems II 1976-1986. Houghton Mifflin Company, 1987.
---. "Bad Mouth."Selected Poems II 1976-1986. Houghton Mifflin Company, 1987
---. "Quattrocento."Selected Poems II 1976-1986. Houghton Mifflin Company, 1987
Bierce, Ambrose. "The Man and the Snake."Blackmask Online, 2001.http:// www.
blackmask.com.
DeWit, Adrianna. "Forked Tongue: Constellations of Language in